ভাবমুখে

শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দদেব প্রতিষ্ঠিত

শারদীয়া সংখ্যা : আশ্বিন : ষট্‌ত্রিংশ বর্ষ : তেরশ উননব্বই : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, সিউড়ী

আশ্বিন
শারদীয়া সংখ্যা

উদ্বোধন

ষট্‌ত্রিংশ বর্ষ
তেরশ' উননব্বই

গীত	১৩৩	শ্রীশ্রীঠাকুর
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঙ্গলকাব্য	১৩৬	শ্রীঅর্চনাপুরী
হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব	১৩৯	ডঃ শ্রীদুর্গাদাস বসু, সরস্বতী, বিদ্যাবারিধি
পাশ্চাত্য ও ভারতীয় জীবন ভাবনা	১৪৭	শ্রীবুদ্ধদেব চ্যাটার্জী
মাতৃবন্দনা প্রকৃতি	১৫১	শ্রীগোপাল দাস কাব্যভারতী
অলৌকিক বিরাময় রহস্য	১৫২	শ্রীরাখালকৃষ্ণ আচার্য
তুই যে আমার প্রিয়	১৫৩	শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক
মহাধর্মাধিকারীর আত্মাহুতি	১৫৪	শ্রীদীপেন রায়
বাঙালীর দুই "অমৃত" পরিবেষক	১৫৫	শ্রীনন্তীশচন্দ্র নাথ
শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ বন্দনা	১৫৭	শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
তুমি ডাক দিয়েছ	১৫৮	শ্রীযোগমায়াপুরী
যুগাবিরাজ (গীতি-আলেখ্য)	১৬০	শ্রীঅর্চনাপুরী
ক্ষমা	১৬৫	শ্রীমতী কণপ্রভা ভাদুড়ী
কুমারী পূজা	১৬৮	শ্রীসাধনাপুরী

সদ্য প্রকাশিত ঃ—

স্বামী অরুণানন্দের

"প্রণতি"

কাব্যলতার কুসুমাঞ্জলি। এর প্রতিটি কুসুম ভক্ত সন্ন্যাসীর প্রেমাশ্রু চন্দনে সিক্ত। এই স্মরণমঙ্গল কাব্যগ্রন্থ কবির আত্মনিবেদনের পরম উপলব্ধিতে ও আবেগপূর্ণ কথায় ও সুরে পূর্ণতা ও সার্থকতা লাভ করেছে

মূল্য : ছয় টাকা

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসদন
২, সি.কে. সাহা লেন
কলি-৩৬ (ফোন : ৫২-৭১৩৩)

শ্রীসত্যানন্দ সেবাসদন
১, ইব্রাহিমপুর রোড,
কলি-৩২ (ফোন : ৭২-১৩৭১)

শারদোৎসবে জানাই
সশ্রদ্ধ নমস্কার

হাওড়া মোটর কোম্পানী
– লিমিটেড –
কলিকাতা

DRINK
ORPHAN'S TEA
For
HEALTH & ECONOMY
ORPHAN TEA SYNDICATE
133 Cornwallis St., Shyambazar
Phone : 55-2704

ফোন : ৩৪-৭২৫৬
এন্, কে, স্পোর্টস্
৬৭এ, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯
যাবতীয় খেলাধূলার সরঞ্জাম এবং
শীল্ড ইত্যাদি বিক্রেতা বিভিন্ন ক্রীড়াসং
কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠ
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম পরিচালিত বিদ্য
সমূহের যাবতীয় প্রয়োজনীয় খেলাধূ
সরঞ্জাম আমরা সরবরাহ করিয়া থা

"মানুষের মাঝে মানুষ রতন আছে"—শ্রীশ্রীঠাকুর

D.RATAN & Co.
Photographers PHOTO
22-1, CORNWALLIS ST. CAL 6
PHONE : 34 - 5711

ডি. রতন এণ্ড কোং
ফটোগ্রাফার্স
ফোন ৩৪ - ৩৭১১

গান		শ্রীশরণাপূরী
যে আঁধারে আছো তুমি		শ্রীসন্তোষ কুমার অধিকারী
অঘটন ঘটনের অলৌকিক রহস্য উদ্‌ঘাটকের দীক্ষা		শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ বাগচী
ভাবমুখের কথামৃত		স্বামী বোধানন্দ
কাঠুরের আত্মবিলাপ		শ্রীআশিস সান্যাল
তৃষ্ণা		শ্রীসুবেন্দু মল্লিক
সেই সত্য সেই ধ্রুবলোক		শ্রীরণজিৎ কুমার সেন
শ্রীচৈতন্য, বঙ্গসংস্কৃতিতে সত্যাগ্রহী চেতনা		শ্রীঅনন্তকুমার সেন
সৃষ্টিতত্ত্ব – আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এবং আমাদের শাস্ত্রে	১৮৭	শ্রীঅক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
দিনের শেষে	১৯৭	কবিকঙ্কন হেমন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
মাণিকবাবাচুকরের অলৌকিক জীবনকথা	১৯৪	বন্ধু মধুর
অপাংক্তেয়	১৯৭	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন
দিলীপকুমার রায়ের চিঠি	১৯৯	
তুমি যে শীতল জল	২০১	অপন বুড়ো

'ভাবমুখের নিয়মাবলী'

ভাবমুখে সিউড়ী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের মুখপত্র

বর্ষারম্ভ বৈশাখ মাস। বর্ষের যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়, কিন্তু কমপক্ষে ৬ মাসের গ্রাহক হইলে সুবিধাজনক হয়। বার্ষিক চাঁদা বছরের প্রথমেই অগ্রিম দিতে হইবে।

বার্ষিক মূল্য সডাক টাঃ ১২·০০। ষাণ্মাসিক টাঃ ৬·০০।

রচনা : ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশ হইয়া থাকে। প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠান প্রয়োজন। ছয়মাস পরে অমনোনীত প্রবন্ধাদি নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। কোন রচনা প্রকাশ করা সম্পূর্ণরূপে সম্পাদকের অভিমত সাপেক্ষ। সমালোচনার প্রয়োজন হইলে দুই কপি করিয়া পুস্তক প্রেরণ করা আবশ্যক।

বিজ্ঞাপন : বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু পূর্বমাসের মধ্যে পাঠাইলে উহা পরবর্তী মাসে প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জানিতে পারিবেন।

বিঃ দ্রঃ গ্রাহক গ্রাহিকাগণের প্রতি নিবেদন এই যে, পত্রিকা উপযুক্ত সময়ে না পাইলে সর্বপ্রথম স্থানীয় ডাকঘরে সন্ধান লইবেন এবং পরে অফিসে জানাইবেন। পত্রাদি লিখিবার সময় গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করিবেন।

কোন গ্রাহক-গ্রাহিকা ঠিকানা পরিবর্তন করিলে উহা পূর্ববর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে কার্যালয়ে জানান আবশ্যক।

বার্ষিক চাঁদা বৈশাখ মাসের মধ্যে মনিঅর্ডার যোগে, গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা মনিঅর্ডার ফর্মের সর্বনিম্ন কুপনে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া "স্বামী পরমানন্দ, ভাবমুখে সচিব, ২, পি. কে. সাহা লেন, কলিকাতা-৩৬" (ফোন : ৫২-৭১০৩) এই ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন।

শাল, আলোয়ান, সোয়েটার, সকল রকম শীতের পোষাক, বেনারসী, সিল্ক, তাঁতবস্ত্র
মিলবস্ত্র সর্ব্বপ্রকার তৈয়ারী পোষাক, হোসিয়ারী ও আধুনিক ডিজাইনের
ডেকরণ, টেরিলিন, টুইল ও ওয়াস্ এণ্ড ওয়ার শাড়ী বিক্রেতা।

রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ
বড়বাজার, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-২৩০৩

Electrical Motor, Double Ended Grinder, Polishing
& Buffing, Flexible Shaft Grinder Etc.

MANUFACTURED BY :
RAMKANAI ELECTRO WORKS
26/2, PRIYANATH MIDDYA ROAD, (Belgharia)
CALCUTTA-700056.
Phone : 58-1575

Gram : DISWASHING
PHONE : { *Office* 24-1236 / *Works* : 55-1738

PELICAN ENGINEERS
Fabricators of Stainless Steel Chemical Plants,
Pharmaceutical & Fruit Preservation Equipments.
4, HARTFORD LANE, CALCUTTA-700016.
Works : 161, Upper Chitpur Road,
Calcutta-700005

শ্রীশ্রীমাতা আনন্দময়ী	২০২	স্বামী নচিকেতানন্দ
অনুরোধ	২০৭	শ্রীঅনিলকুমার সরকার
তিনটি কবিতা	২০৭	রমেন্দ্র নাথ মল্লিক
অষ্টমীর ক্ষণ	২০৭	স্বামী ভদ্রেশ্বরানন্দ
কলি দীর্ঘায়ু হোক, ভয় কি।	২০৮	স্বামী মুক্তানন্দ
ও চরণ আমি চুমি	২১০	অরুণ নীল
উমার নিবার্চনা	২১১	সুনীল কুমার লাহিড়ী
দীনের দরদী	২১৩	স্বামী অরুণানন্দ
The Legend of Ramanujacharya	33	Sri P. S. Rao
Sree Chaitanya and His Kirtan Sang	39	Samar Dutta
Book Review	41	Gopal Bhowmik
Spiritual Talks	42	Sri R. L. Goel s Diary
Bengal Down The Ages	43	Prof. Kausambi Nath Mallik
Horizon and the Sea	46	Sri Jyotsna Nath Mallik

* আশ্রম পর্ব্ব পঞ্জী : কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯

১৮ই	অক্টোবর,	১লা	কার্ত্তিক,	সোমবার	— ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।
২৬শে		৯ই		মঙ্গলবার	— শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা।
২৮শে		১১ই		বৃহস্পতিবার	— একাদশীর উপবাস ও রাত্রে হোম।
৩১শে	”	১৪ই		রবিবার	— শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা।
১লা	নভেম্বর	১৫ই		সোমবার	— পূর্ণিমার হোম।
১১ই		২৫শে		বৃহস্পতিবার	— একাদশীর উপবাস ও রাত্রে হোম।
১৫ই		২৯শে	”	সোমবার	— অমাবস্যার হোম।
২৩শে		৭ই	অগ্রহায়ণ	মঙ্গলবার	— দুবরাজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে চারদিন ব্যাপী শ্রীশ্রীসারদা-কাত্যায়নী দেবীর সপ্তম্যাদি পূজারম্ভ।
২৭শে		১১ই		শনিবার	— একাদশীর উপবাস ও রাত্রে হোম।
৩০শে	”	১৪ই		মঙ্গলবার	— পূর্ণিমার হোম।
৭ই	ডিসেম্বর	২১শে		মঙ্গলবার	— সিউড়ী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে তিনদিন ব্যাপী জগদ্ধাত্রী শ্রীশ্রীসারদা দেবীর ১৩১তম আবির্ভাব তিথি উৎসব।
				শনিবার	— একাদশীর উপবাস ও রাত্রে হোম।
				বুধবার	— অমাবস্যার হোম— আংশিক গ্রাস সূর্যগ্রহণ—স্পর্শঃ অপরাহ্ণ ঘঃ ৩।১৭ মেঃ ; মোক্ষঃ বৈকাল ঘঃ ৫।৫৩।২৪ মেঃ।

● বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পত্রিকা মতে।

শ্রীরামকৃষ্ণপদ ভরসা

৺রামাপদ ঘোষ প্রতিষ্ঠিত

নারিকেলডাঙ্গা রোলার ফ্লাওয়ার মিলস্

১৭/৪, কেনেল ওয়েষ্ট রোড, কলিকাতা-৬

স্থাপিত ইং ১৮৮৮ সাল

৯৪ বৎসরের

জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৩৫-৪১২৪
৩৫-৪১১৫

। স্বত্বাধিকারী ।

রথীন্দ্রনাথ ঘোষ এ্যাণ্ড ব্রাদার্স

মডার্ণ ডেকরেটর্স

শুভবিবাহ ও যে কোন উৎসবের
প্যাণ্ডেল ও গৃহসজ্জায়

৬৫এ, ডব্লু, সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট, কলি-৬

ফোন : ৫৫-২১৪৯, ৫৫-৬৫৬৫

With best compliments from :

RELIABLE ENGINEERS & TRADERS

25, Harachandra Mullick Street,
Calcutta-700005

BHOWANIPORE TUTORIAL HOME

Estd.—1941

MAIN OFFICE & SCHOOL DEPT.

59-A, Shyamaprasad Mukherjee Road (Hazra Rd. Jn.) Calcutta-700026

Phone : 47-4926

COLLEGE DEPARTMENT

84, Shyamaprasad Mukherjee Road, Calcutta-700026

(Opp. Sevasadan, Inside Rani Sankari Lane)

Phone : 47-4419

Effective coaching for Madhyamik (IX & X). H. S. (XI & XII). B.A., B.SC. & B. Com. - Pass & Hons. M.A., M.SC. & M.Com. candidates Regular & Private. Also coaching candidates for W.B. C.S. C.A. Entrance, Jt. Entrance (Engineering & Medical) & other comp. Exams. Spoken English classes held. Experienced Teachers and Professors. Individual attention in group coaching. Separate arrangement for giris. Admission going on. Enquire between 4 P.M. and 8-30 P. M. except Sundays.

BRANCHES

BALLYGUNGE : 193, Rashbehari Avenue (Opp. Aleya Cinema) Ph. 42-6768

SEALDAH 33-A, M. G. Road (Opp. Purabi Cinema) Ph. 36-1649

SHYAMBAZAR : 1/D, Shyamlal Street (Off. Spt. crossing & Mohanlal Street) Ph. 55-3861

Phone : 26-4573

UNITED METAL MART

58, NETAJI SUBHAS ROAD,

CALCUTTA-1

A Premier House of All Sorts of Cocks & Valves Gun Metal & Cast Iron and Pipe Fittings of All Descriptions

With Best Compliments Of

Gram : COKEOVEN, CALCUTTA
Telephone : 24-4492, 24-5980

INDIA POTTERIES LTD.

Manufacturers of :

Electrical Insulators Upto 33 kv Range As Per I. S. Specification

And

Quality Tableware, 'India' Water Filter, Filter Candles, Figures, Dolls, Toys, Industrial Ceramics Etc. Etc.

Factory :
8, Nilgunj Road, Belgharia,
Calcutta-700056
Phone: 58-1198

Office :
91, Dharmatala Street,
Calcutta-700013

{ Factory : 45-7523
Resi. 45-7499

HIND METAL INDUSTRIES

Dealers in Tea Chest Components.

1, P. N. Mitra Lane, Tollygunge,
CALCUTTA-53

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :

HIND TRADING COMPANY

16, Bonfields Lane,
Calcutta-700001

Dealers in Hardware, Electricals,
Paints and Tea Garden Stores.
Specialist : Tea Machinery Spares.

Phone : 26-4176
27-0155

With respectful remembrance from

Hindusthan Refractories & Ceramics (P.) Ltd.

Manufacturers of :
QUALITY REFRACTORY ITEMS
20, NETAJI SUBHAS ROAD
CALCUTTA-1
Off. : Telephone : 22-7639
Works :
DURGAPUR-11
Telephone : Durgapur-5634

WITH BEST COMPLIMENTS OF :

M. G. Corporation

22, Netaji Subhas Road, Calcutta-1

22-6972

Manufacturers of :
WIRE NETTING, SAUSAGE WIRE, CHAIN LINK NETTING
AND WIRE SCREEN ETC.

Works :
8, O, JOGODYAN LANE, CALCUTTA-11
Phone : 35-6416

'SAFEX' LAMINATED SAFETY GLASS
TOUGHENED GLASS
"TWINBIRD" MIRRORS ETC.

Manufactured by

Hindusthan Safety Glass Works Private Ltd.

2, ST. GEORGE GATE ROAD, HASTINGS,
C A L C U T T A - 2 2 .

Gram : "DEVGLASS" PHONE : 45-0125 (3 Lines)

Phone : 23-7586 (3 Lines)

Derby Tea & Industries Limited

16, HARE STREET, CALCUTTA-1

Producers and Exporters of Quality Teas

Derby Tea Estate
P. O. & T. O. DERBY
Dist. CACHAR (Assam)
Phone : Silchar-171

Nagrijuli Tea Estate
P. O. NAGRIJULI, T. O. RANGIYA
Dist. KAMRUP (Assam)
Phone : Rangiya-82

Tongani Tea Estate
P. O. & T. O. MANGALDAI
Dist. DERRANG (ASSAM)
Phone Kharupatia-74

Lengrai Tea Estate
P. O. & T. O. CHABUA
Dist. LAKHIMPUR (ASSAM)
Phone : Dikom-40

Derby Dyes & Chemicals
NANDESWARI, BARODA

Great things can be done by great sacrifices only.
Swami Vivekananda

Gram : SUTTCO

Office : 22-6254 22-6161
23-9033 23-8768
Resi. : 44-3599 43-1387

Sudershan Timber Trading Co.
MANUFACTURERS, MERCHANTS & SUPPLIERS
4, FAIRLIE PLACE,
Calcutta-1
Timber Depot : ITARSI (M.P.)

Factories :
YAMUNANAGAR
PATHANKOT

WITH THE COMPLIMENTS OF :

Phone 22-5730 (10 Lines)

VOLTAS LIMITED
Gillander House
Netaji Subhas Road,
Calcutta-700001

With Best Compliments From :

Office 22-6254, 23-9033, 23-8768
Resi. 44-3599

AVADH PLYWOOD INDUSTRIES

4, FAIRLIE PLACE,
Calcutta-700001

Gram : BEHARCAST

Office : 23-7586
Works : 58-2732
58-2733
58-2734

With best compliments of :

Bihar Malleable Castings Ltd.

A new name in the
STEEL INDUSTRY

16, Hare Street, Calcutta-700001

Undertakers of Precision Castings, Grey Alloy,
Graded & High Duty Iron Cast & Alloy Steel.

PALANPURIS
TELEX No. CA-7719, TEEMADE

Tel. 22-4820

Estd—1908

Madhavlal & Co.

EXPORTERS & IMPORTERS

11, Ezra Street,
G.P.O. POST BOX NO-2465
Calcutta-700001

Blenders and Exporters of Finest Quality Teas and Golden Dust.

N. G. CHAKRABARTI & CO.

Manufacturers of :

Alloy Steel Castings

SUCH AS

Nickel Chrome Steels
Heat Resisting Steels
Stainless Steels
Austenitic Manganese Steels
Made In
Induction Furnace.

ALSO

Finest Grey Iron Castings
Heat Resisting Alloy Iron
High Duty Iron
Thin walled Castings
Graded Iron Castings

OF

All Special Grades & Sizes

●

Quality Guaranteed

Works

K-65, Howrah Industrial Estate,
P.O. Balitikuri
Howrah, (*West Bengal*)
Telephone : 69-2890

Head Office :

N. G. Chakrabarti & Co.
3D, Nandy Street,
Calcutta-700029
Phone : 42-5197

শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দদেব প্রতিষ্ঠিত

ষট্‌ত্রিংশ বর্ষ	তেরশ' উননব্বই	আশ্বিন	শারদীয়া সংখ্যা

।। গীত ।।

শ্রীশ্রীঠাকুর

শরৎ সোনায় মেঘের কোণায়
কার সে হাসির দোল,
রামকৃষ্ণ বোল রামকৃষ্ণ বোল
রামকৃষ্ণ বোল।
কাশে কাশে ঘাসে ঘাসে
কচি ধানের নিমিল হাসে
পাতা রে কার কোল।
আগের কথা পিছের ব্যথা
ছড়িয়ে না রয় হেথা হোথা
ভোল রে ভোলা ভোল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঙ্গলকাব্য

শ্রীঅর্চনাপুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আরো একদিন মেঘে মেঘে রঙ খেলা
যৌ ওন ওন নিরালা গীতালি বেলা
কমলবনের পরাগ করিয়া চুরি
ভেসে চলে যায় বরুণ হাসের ভেলা।

পাতায় পাতায় রাঙা আবিরের ওঁড়ি
বনে বনে শুধু পলাশের লুকোচুরি
মৃগালভা'র ভোমরাকি হারানো ঝোঁপে
বনদেবী জালে মুক্তার ফুলঝুরি।

দেউলে দেউলে শীত শিরাজের পালা
যুঁই বেলী আর মধু চম্পার মালা
ফুল ডালা বহি আসে ফুল পসারিণী
ভোরের অলির চুম্বন স্মৃতি ঢালা।

সোমা পুজারী ত্রিসন্ধ্যা স্নান সারি
তুষিতে সেবায় গোপীজন মনোহারী
সুদূরে কোথায় তীর্থপথ ঝোঁপে
রাবে রাবে জপে কুলায় কাতরা সারি।

বাঁকে বিহারীর অজনে ভিড় জমে
বাঁকি নয়নের চকিত পুণ্যক্ষণে
এসেছে হৃদয় শ্রীপ্রভুরে ল'য়ে সাথে
শিখায়ে বুঝায়ে সাবধানে সযতনে।

হ'সে থেকো মামা ক'রো নাকো ধাড়াধাড়ি
যেহ'দ হ'লেই বুদ্ধিল হবে ভারি
কি বলিবে লোকে তারা কি গো তার বোঝে
খুব ভিড় আজ যেওনাকো হাত ছাড়ি।

দু'চোখে শিশুর আনন্দ কুতুহল
চলেছিল প্রভু উল্লাসে চঞ্চল
হৃদুর কথায় কত যেন আজ রাজী
মুখের হাসিটি সীত পাপলার ধন।

সোপানে উঠিতে চরণ কাঁপে না আজ
শোভিছে অঙ্গে মধুরের দেওয়া সাজ
সযতনে রাণী সাজায়ে দিয়েছে নিজে
ভিলক মালায় নবনীত রাজরাজ।

হাজার কণ্ঠে উচ্চকিত জয়নাদ
ভেঙে গেছে যেন সুখ যমুনার বাঁধ
বাঁকি নয়নের কুসুম নীলারবাশি
চকিতে খুলিতে গণে শুধু পরমাদ।

ক্ষণে দেখা গেল বঙ্কিম মধুঠাম
সজল নবন নবীন নীরদ শ্যাম
রতন প্রদীপে ধারেক ঝলকি ক্ষণে
বাঁশিল আবার সেই রূপ অনুপাম।

কই কোথা গেল পরাণের নাথ মম
কোথায় লুকালো বাদল ভোরনা সম
বলিতে সহসা দুটি বাহু পসারিয়া
ছুটে চলে প্রভু উতরিয়া অঙ্গন।

কুঞ্জ বিপিনে বেজেছে মুরলী মধু
ছোটে যেন মদ বিহ্বলা যুগবধূ
বাহু ভুজঙ্গে আশ্লেষ অনুরক্তি
এস এস প্রাণে এস গো পরাণ বঁধু।

বাঁকি নয়নেতে ভরে নাকো যেন হিয়া
তাই ছুটে আসে পথাধর মরমীয়া
জড়াতে বক্ষে অনুপম তার অঙ্গ
আবেশ উতল আঁখি ওঠে উছলিয়া।

খসিত বসন পুলক আতুর অঙ্গ
অঞ্চল চেয়ে আছো বিলোকন রঙ্গ
রক্ত অধরে স্ফুরিত কৃষ্ণ কৃষ্ণ
দুটি বাহু মাঝে পরাণ নাথের সঙ্গ।

বিরহ পানে ছুটে মেঘে গগনের
ক্ষুব্ধ জনতা—ছত্র কাঁপে থর থর
সামালিতে হায় যেমে নেয়ে হয় সারা
ওঠে কোলাহল চকিত উচ্চস্বর।

দিনান্তরে বাহু মেয়ে চলে প্রভুরায়
বিপুল জনতা ক'রে ওঠে হায় হায়
একি উন্মাদ একি গো উন্মাদনা
পূজার দেবতা তারে পরশিতে চায়।

বিহারী নাথের নয়নে নয়ন রাখি
বিবশে শ্রীপ্রভু সহসা ওঠেন কাঁপি
কোথা গেল সেই মত্ত বিরহ তার
লুটালো ধূলায় দুখন ধরিল চাপি।

সাগরে আকাশে কোথায় হারালো দিশে
জোছনা ঊর্মি এক হ'য়ে গেল মিশে
ঘুমারও ঊর্ধ্বে আরো আরো নাকি ঘুমা
অসীমে অসীম একাই হয়ে গেল মিশে।

অচেতন তনু আওলি মক্ষ নীড়ে
বাঁচাইয়া ভিড় ছত্র চলে ধীরে ধীরে
তখনও অফুটে জল্পনা নানা কথা
সত্ত গুঞ্জন উঠিতেছে ফিরে ফিরে।

এ ছবি হেরিয়া মনে আসে এক স্মৃতি
হয়তো সেদিনও রাঙা আবীরের প্রীতি
মাখানো ছিল গো গোধূলির মেঘরাগে
পুরীর সিংহ দুয়ারে এল সে ভিখি।

সাগর মেখলা সেই নীলাচল পথে
সেদিনও তো ওগো উন্মন মনোরথে
ছুটে এসেছিল প্রেমের দেবতা গোরা
ঘর ঘর জল ঝরারে নয়ন হ'তে।

সাগরে ঝিনুকে ঊর্মির মালা গাঁথি
নিঠুর যোগীর পায়ে দিয়েছিল সাথি
চকোর কাঁদানো সে রূপ চাঁদের ছায়া
কেবার বুকুরে রাখিবারে চেয়ে বাঁধি।

সাগরের বুকে ঢেউয়ের হুতাশ হানি
বলেছিল গোরা আকুলি দুখখানি
হে জগন্নাথ স্বামী পরাণের নাথ
দেখা দাও হও এ নয়ন পথগামী।

সেদিনও লইয়া আলিঙ্গনের তৃষা
নীল বেলা বুকে রচি দিয়া মৃদুতৃষা
ছুটে ছিল গোরা জগন্নাথের পানে
মূর্চ্ছা বিলাপে হারায়ে এমনি দিশা।

সুদূর স্মৃতির সেই পথখানি বাহি
হারানো চরণ চিহ্ন কি আজো চাহি
আজো ছোটে মন অন্তীত সাগর তীরে
অনাদি তীর্থে চির অজানার রাহী।

তীর্থে কালের সাগরের পারাবার
কালের নাবিক বেঁধেছে তরণী তার
দুই কূলে শুধু সময়ের বিহরণ
জোয়ার ভাঁটার আসা যাওয়া অনিবার।

গঙ্গামায়ীর মঞ্জুল নিধু কুঞ্জে
এখন ফাগুন নন্দিত ফুলপুঞ্জে
মুখর কুঞ্জ হরিময় রসরাগে
মত্ত মধুপ বিলাস মদির গুঞ্জে।

রসাল অঙ্গে ঘুমানো মাধবী কলি
মিথিল লাস্যে মধু প্রণয়ীরে ছলি
সুরভি বিবশা দুটি আঁখি মেলে হাসে
পাপড়ি মেলিতে মৃদু গুঞ্জন তুলি।

হারানো দিনের মত কি কুঞ্জ মাঝে
চকিত চরণে কল-মঞ্জীর বাজে ?
অধরের বেণে ঐ তো দুলারী রাধা
গঙ্গামায়ীর পর্ণকুটীরে রাজে ।

মধুরের সেবা সেউল রহিল পড়ে
ফিরে গেছে ছুট ডেকে ডেকে ঘোর ঘরে
পেয়েছে দুলারী প্রিয় অলিতার দেখা
রাখিতে না পারি ঘরে গেছে আরি ঘরে ।

কোনদিন যেঁাকে পুরানো দিনের কথা
মনে পড়ে গেছে মাধবের ব্যাকুলতা
সঙ্কেত বাটে বারবার আনাগোনা
দেখিতে বারেক বিধুমুখী রাধালতা ।

কহিল গঙ্গা দুলালী মিঠুয়া সই
তবুও সেদিন তারে দেখা দিলি কই ?
দেখিতেই দিলি রাই চম্পক লতা
পাষাণও পেতো মা ঐ হিয়াটার ব্যথা ।

কুঞ্জ দুয়ারে প্রেমগহনা সহি
শিথিল চুয়ার কলঙ্ক ডালা বহি
ফিরে গেল সেই বহুবল্লভ অলি
কাঁদিল বাতাস বাসি ফুলে মহমহি ।

যমিন শুক বিজয়ে বঁধুপানে
বারেক চাহিয়া বলেছিলি আজে মনে
ভ্রামরী মিতালি যার সখী তার মিছে
কাঁটার কুঞ্জে আসা কেন কেবা জানে ।

হয়তো তখন যৌ চম্পক ভালে
ধরা পড়ে গেছে সোনার আলোর জালে
প্রেম আহত দুটি কালো প্রজাপতি
বিবশ ডানাটি কাঁপিছে নিশাদ তালে ।

তমিস্রা শিহরি উঠে ধরণীর বায়
আর না সজনি থাম্ পড়ি তোর পায়
সরাহত সুরে বাজিল কোথায় বাঁশী
বিবশা রাধার প্রেমে প্রভু মুরহায় ।

কেঁদে কয়, ফিরা যমুনার বালুচরে
তার চলে যাওয়া চিহ্নটি আজে প'ড়ে
মোর ঢি-ঢুবালী মিঠুর করেছে তারে
যাহা দিয়ে যাহা পেয়েছিই বুক ভ'রে ।

ধূলায় ছিঁড়িয়া নীলকুবলয় মালা
মলয়জ রজে জুড়াতে যাতনার জ্বালা
জোছনাও বুকে আগুন দিয়েছি জেলে
ছড়ায়ে ঝরেছে তারা কাঞ্চনের ডালা ।

উঠসিয়া কয় ফিরে এসো প্রিয়তম
অনাদৃতা রাধা তার অপরাধ ক্ষম
মানের কুসুম ভাসায়ে যমুনা জলে
বিরহ কাঁটায় রচেছি শয়ন মম ।

দীঘল বিরহ রজনী ভাসিয়া কুহু
কীচক কুঞ্জে কেঁদে ওঠে মুহুমুহু
সোহাগ সুরভি হারায়ে কাঁদিল মাধবী
মহুয়ার বনে বাতাস বহিল হু হু ।

চন্দ্রাকিশোর ধূলায় লুটায়ে কাঁদে
গঙ্গামায়ীর মনও বাঁর নাহি বাঁধে
ফেলে দিতে গিয়ে স্মৃতির শুকানো ফুল
কখন কাঁটাটি গেঁথে গেছে হিয়া কাঁদে ।

(ক্রমশঃ)

"লীলা নিত্য—তাই নিত্য-ব্রজে ব্রজেশ্বরের বাঁশরী কোনদিনই হয় না নীরব ।
প্রকাশলীলার ছেদ আছে—বিরহ মিলন আছে – তাই প্রকাশলীলা এত মধুর ।"
—শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দ

হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব

ডঃ শ্রীসুধাংশুরঞ্জন বসু, সরস্বতী, বিদ্যাবারিধি, এম, এ., এল্. এল্. ডি., ডি. লিট্.
[অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, কলিকাতা হাইকোর্ট]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, পশুর ন্যায় মানুষের দেহটিও জৈবিক উপাদানে গঠিত, সুতরাং মূলতঃ সংস্কার বিহীন মানুষের বৃত্তি ও ক্রিয়াকলাপ পশুসদৃশ এবং সেই পশুত্বের আচরণ এবং জৈবিক আকাঙ্ক্ষাগুলিই তাহাকে সংসার চক্রে আবদ্ধ করিয়া পুনঃ পুনঃ দেহধারণ করিতে বাধ্য করাইতেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে সাধারণ মানুষ সেই দেহটিকেই তাহার নিজের সত্তা বা আমি বলিয়া অভিহিত করে এবং আত্মা হইতে সেই আমিকে পৃথক মনে করে।[১১]

কিন্তু, এই পশু দেহের আবরণে[১২] প্রত্যেক মানুষের আত্মিক দেবত্বটি প্রচ্ছন্ন আছে। সুতরাং জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারচক্র হইতে মুক্তিলাভের উপায় হইতেছে সেই অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ বা আত্মার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করা,[১১-১২] কারণ আত্মার জন্ম মৃত্যু হইতে পারে না[১৩] সুতরাং সেই সকল কার্যই মানুষের নিঃশ্রেয়স বা প্রকৃত মঙ্গল আনয়ন করিতে পারে, যাহা দ্বারা তাহার দেহের জৈবিক আচ্ছাদন হইতে আত্মাকে নিষ্কাসিত করিয়া[১৪] তাহার দেবত্বের সত্যস্বরূপকে প্রস্ফুটিত করিবার সহায়তা করে সেই সকল কার্য বা উপায়ের সমষ্টিই প্রকৃতি হিন্দুর ধর্ম'।

প্রকৃতপক্ষে, যে সকল সৎকর্মের দ্বারা মানুষের এই অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ হয়, তাহা সম্পাদন করিলে এবং ব্যক্তিসমূহ এইরূপে উন্নত হইলে, শুধু ব্যক্তি নহে, সমগ্র জগতের রক্ষণ হইবে ;[১৫] সুতরাং অহিংসা, সত্য, শুদ্ধ, তপস্যা, ইহারা বিশ্বজগতের প্রতিষ্ঠা।[১৬]

হিন্দু ধর্মের লক্ষ্য ঃ হিন্দু ধর্মের লক্ষ্য হইতেছে জন্ম-মরণ বন্ধন হইতে মুক্তি বা মোক্ষ লাভ।[১৭] কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান[১৮] বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি[১৯] বিনা এই সংসার বন্ধন ছিন্ন করা যায় না। কিন্তু ব্রহ্ম পূর্ণতম এবং শুদ্ধতম সত্তা।[২০] সুতরাং ব্রহ্মকে পাইতে হইলে[২১] ব্রহ্মের ন্যায় পূর্ণত্ব অর্জন করিতে হইবে, ইহাই হিন্দুধর্মের মর্মবাণী।[২২]

'ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি।[২৩]

অর্থাৎ ব্রহ্মের ন্যায় হইতে পারিলে তবেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি অথবা মোক্ষলাভ হওয়া সম্ভব।[২৪] এইরূপে, হিন্দুধর্ম ভগবান্‌কে সুদূর স্বর্গরাজ্যে সার্বভৌম সম্রাটের সিংহাসনে বসাইয়া না রাখিয়া, তাঁহাকে মনুষ্য জীবনের আদর্শ এবং লক্ষ্যে পৌঁছিবার উপায়রূপে নির্দেশ করিয়াছে। মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্বে উন্নীত হইতে হইলে আমাদের ভাল হইতে হইবে ইহা সহজেই অনুমেয়, কিন্তু সেই ভালর আদর্শ যে ভগবান স্বয়ং (সুতরাং অসীম ও অপরিমেয়) হিন্দুধর্মের এই মূল তথ্যটি অন্য ধর্মাবলম্বীর পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নহে ; এমন কি আমাদের অনন্ত শাস্ত্ররাজির বিধিনিষেধ ও মন্ত্রতন্ত্রের চাপে হিন্দুধর্মাবলম্বীর পক্ষেও বিভ্রান্ত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু প্রামাণিক শাস্ত্রসমূহ পুনঃ পুনঃ এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছে যে, কেবলমাত্র যাগযজ্ঞ, মন্ত্রতন্ত্রের দ্বারা মুক্তি লাভ করা যাইবে না,[২৫] একমাত্র উপায় হইতেছে ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্তি। অন্য কথায় বলিতে গেলে, প্রতিটি মানুষের আদর্শস্বরূপ হইয়া যাওয়াই হিন্দুধর্মের উদ্দেশ্য ; ইহাতে কোনও মতবাদের অবকাশ নাই, ইহার কোনও বিকল্প সংক্ষিপ্ত সূচী নাই

এবং পূর্বেই বলিয়াছে যে, মানুষকে দেবত্বে রূপান্তরিত করিবার জন্য বাহির হইতে কিছু উপকরণ আহরণ করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ, 'ব্রহ্ম মানুষের আত্মাতেই অধিষ্ঠিত[৩১]—ব্রহ্মত্বই মানুষের স্বরূপ।[৩২] অতএব ব্রহ্মের ভাব' হওয়ার[৩৩] অর্থ মানুষের প্রকৃত সত্তা বা সত্তাকে উদ্ঘাটিত বা বিকশিত করা; এবং সর্বপ্রকার অসদ্‌বৃত্তি ও অজ্ঞানতার জৈবিক আবরণটিকে অপসারিত করিতে পারিলেই[৩৪] সেই ব্রহ্মত্ব আপনিই প্রকটিত বা অভিব্যক্ত হইবে।

কিন্তু ইহাও সহজে অনুমেয় যে, কোনও ব্যক্তির পক্ষে মনুষ্যজীবনের সীমা উত্তরণ করিয়া এবং মানব দেহের রক্তমাংসের সর্বপ্রকার বিকার ও সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত হইয়া দেবত্বে আরোহণ করিতে হইলে তাহার সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন প্রয়োজন। যে অসংখ্য সোপান এবং উপায় অবলম্বন করিলে এই অভিযানের শীর্ষদেশে উপনীত হওয়া যায়, তাহার প্রাথমিক, কিন্তু আবশ্যিক সোপান হইতেছে সদাচার অনুষ্ঠান।

আচার : 'আচার', 'আচরণ' 'চরিত্র' শব্দ—একই 'চর' ধাতু (অর্থ—'চলা') হইতে নিষ্পন্ন। সুতরাং 'আচার' বলিতে জীবনযাপনের পদ্ধতিতে বোঝায় এবং যে ব্যক্তি যেরূপ আচার পালন করে, তাহার চরিত্রও সেইভাবে গঠিত হয়।[৩৫] অর্থাৎ অহিংসা, সত্যাশ্রয়, অস্তেয় ইত্যাদি সদাচার অনুষ্ঠান করিলে দৈবভাব বা 'দৈবীসম্পদ' এবং দম্ভ, দর্প, অভিমান, অশুচি প্রভৃতি কদাচার অনুসৃত হইলে অসাধু চরিত্র বা 'আসুরী সম্পদ' জাত হয়; শুধু তাহাই নহে, ঐ সৎ বা অসৎ সম্পদগুলি লইয়াই প্রত্যেক ব্যক্তি পরবর্তী জন্মে জন্মগ্রহণ করে।[৩৬] অর্থাৎ, কেহ সদাচারনিষ্ঠ হইলে তাহার মোক্ষযাত্রা সুগম ও ত্বরান্বিত হয়, কিন্তু কদাচার লিপ্ত হইলে সেই আসুরী সম্পদের বোঝা তাহার বন্ধনের কারণ হয় এবং তাহার মোক্ষপ্রাপ্তিকে বিলম্বিত করে।[৩৭]

সদাচার : কাজেই চরিত্রের উৎকর্ষ লাভ করিতে হইলে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সদাচার পালন করিতে হইবে,[৩৮] ইহাতে প্রশ্নের অবকাশ নাই; কিন্তু 'সদাচার' বলিতে কি বুঝায়, বিভিন্ন দেশে, ধর্মে এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিষয়ে গুরুতর মতভেদ মনুষ্যজাতির ইতিহাসে একটি চিরন্তন সমস্যা। তবে, ধর্ম যেমন ধ্রুবতারার মত একটি অবিচলিত, অনমনীয় আদর্শ, সদাচার সেইরূপ হইতে পারে না। কারণ দেশ, কাল, জাতিগত ঐতিহ্য ইত্যাদি বহুবিধ কারণে মানুষের অভাব অভিযোগ আচার-ব্যবহার, সামাজিক সমস্যাগুলি বিভিন্ন প্রকার হওয়াই স্বাভাবিক,[৩৯] সুতরাং তাহাদের সমাধানের প্রণালী অনুরূপ হইতে পারে না। এইজন্যই সর্বজ্ঞানময় মনু, সদাচারকে ধর্মের লক্ষণ এবং অপরোক্ষ সূত্র[৪০] বলিয়া অভিহিত করিলেও, ইহা যে দেশ এবং কালসাপেক্ষ তাহাও বুঝাইয়া দিয়াছেন। মনুসংহিতায় সেই সকল আচারই তিনি সদাচার বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, আচার সমূহ 'পারম্পর্য' ক্রমে 'ব্রহ্মাবর্ত', নামক ভূখণ্ডে জনসমাজে তাঁহার জীবৎকালে প্রচলিত ছিল।[৪১] তিনি ইহাও পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন যে, জীবনের উদ্দেশ্য মোক্ষলাভ এবং তাহার উপায় হইতেছে ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান।[৪২] সুতরাং লক্ষ্যটিই আসল, উপায়গুলি গৌণ; আধ্যাত্মিক জগতে নিবৃত্তিমার্গে আরোহণ করিয়া যাঁহারা আত্মজ্ঞানে মহীয়ান্ তাঁহাদের পক্ষে শাস্ত্রোক্ত কর্ম, আচার অনুষ্ঠান ত্যাগও মূল্যবান নহে।[৪৩]

বলাই বাহুল্য, ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানের উৎস হইতেছেন শ্রুতি এবং যদি কোনও বিষয়ে দেশাচার বা লোকাচার শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া সন্দেহ হয়, সেক্ষেত্রে বেদই গ্রহণীয় এবং মনুস্মৃতি শাস্ত্র আচারাদি পরিত্যাজ্য হইবে।[৪৪-৪৫] কোন্‌টি সদাচার অবস্থাভেদে সে বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে; ইহা শ্রুতিতেই বলা হইয়াছে এবং সেক্ষেত্রে ধর্মপরায়ণ এবং নিষ্কাম মহাজনদিগের আচরিত পন্থাকে অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।[৪৬-৪৭]

উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহা প্রতিপন্ন হইল যে, যেমন—সত্যভাষণ, অহিংসা প্রভৃতি কতগুলি সদাচার দেবত্বে অধিরোহণের জন্য অপরিহার্য, তেমনি ধর্মের মূল উদ্দেশ্যটি ভুলিয়া শাস্ত্রলিখিত প্রতিটি আচারকেই ধর্ম

বলিয়া গণ্য করিলে তাহার আভিধেয় মানুষকে বিপথগামী করিতে বাধ্য (যেমন 'তাঃবাঃ')। পরন্তু, যদি ইহা স্মরণ রাখা যায় যে প্রতিটি আচার সৃষ্টির পশ্চাতে আছে একটি উদ্দেশ্য, এবং তদানীন্তন সমাজে উদ্ভূত কোনও বিশেষ সমস্যার সমাধানের প্রয়াস, তাহা হইলে অবস্থাভেদে সেই আচারের সংশোধন বা পরিবর্তন করিলেও[১১] ধর্মের কোনও হানি হইবে না বা মোক্ষলাভ ব্যাহত হইবে না।[১২]

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ধর্মের প্রাথমিক স্তরে আচার পালন অবশ্য কর্তব্য এবং সদাচার ধর্মের সোপান স্বরূপ, কিন্তু ধর্মের উদ্দেশ্য আচার-অনুষ্ঠানের বহু উর্ধ্বে। স্থান-কাল-পাত্রভেদে আচারের পরিবর্তন হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম শাশ্বত এবং কয়েকটি বিকারহীন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ; সামাজিক বা লৌকিক অবস্থা ভেদে এই সকল নীতি বা তত্ত্বের কোনও পরিবর্তন হয় না। এই সকল মৌলিক তত্ত্বকেই আমরা ধর্মের সারবস্তু বলিতে পারি।

পুণ্যকর্ম : এই প্রসঙ্গে পুণ্যকর্ম সম্বন্ধেও উল্লেখ করা উচিত। কোনও কোনও ধর্মে লোকহিতকর কার্য বা সৎকর্মকে ধর্মের চরম অবস্থা বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রে ধর্মের উদ্দেশ্য পুণ্যকর্মেরও ঊর্ধ্বে—তাহা হইতেছে ব্রহ্মপ্রাপ্তি। তাহার কারণ, একমাত্র ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বারাই মোক্ষ বা জন্মমরণরূপ চিরন্তন দুঃখ হইতে, পরিত্রাণ পাওয়া যায়[১৩] কেবলমাত্র পুণ্যকর্ম বা সাত্ত্বিক ক্রিয়া করিলে 'পুণ্যলোক' বা স্বর্গলাভ হইতে পারে।[১৪] কিন্তু সেই পুণ্যের সুকৃতি ক্ষয় হইলে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে[১৫]—অতএব, সমস্যার সমাধান হইল না।

হিন্দুধর্মের এই তত্ত্বের গভীরতা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কোনও কোনও বিধর্মী সমালোচক বলিয়াছেন যে, হিন্দুধর্ম স্বার্থপরের, ধর্ম ইহার দ্বারা জগতের বা আর্তমানব জাতির কোনও কল্যাণ সাধিত হইবে না। এই ভ্রান্ত ধারণাকে অতিরঞ্জিত করিয়াই বর্তমানে অশিক্ষিত হিন্দুদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া ধর্মান্তরিত করা হইতেছে। কিন্তু ইহার জন্য মূলতঃ শিক্ষিত হিন্দুরাই দায়ী, কারণ তাঁহারা হিন্দুধর্মের আদর্শ হিন্দুত্ব হইয়া একান্ত স্বার্থপরের জীবনযাপন করিতেছেন এবং স্বীয় ধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞতা বশতঃ, ভারত সেবাশ্রম বা রামকৃষ্ণ মিশনের ন্যায় সর্বজনানুমোদিত সেবাপ্রতিষ্ঠানকে সাহায্য না করিয়া যাহারা বলে-বলে-কৌশলে ধর্মান্তকরণের দ্বারা হিন্দুজাতিকে হীনবল করিতেছেন, সেইসব বিধর্মী প্রতিষ্ঠানকে দানাদির দ্বারা পরিপুষ্ট করিতেছেন কিন্তু এইসকল ভ্রান্ত হিন্দুর ব্যক্তিগত আচরণের দ্বারা হিন্দুধর্মকে বিচার করা চলে না।

অতএব দেখা যাক যে, হিন্দুধর্মে সেবাকার্যের স্থান কি ? হিন্দুধর্ম মতে, জনসেবা কেবলমাত্র সামাজিক কর্তব্য বা পুণ্যকার্য নহে। ইহা মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি বা ঈশ্বরপ্রাপ্তি সাধনার চরম সোপান। অর্থাৎ ধর্মের অন্যান্য অনুশাসন ও নিয়মাদি পালন করিয়া সাধক দেবত্বের স্পর্শলাভ করিবার পরও মোক্ষ ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আরও কিছু বাকী থাকিয়া যায় ; তাহা হইতেছে 'লোকসংগ্রহ'[১৬] বা 'সর্বভূতহিত'[১৭]—সাধন।

যেহেতু লোকসেবা হিন্দুধর্মের চরম সোপান, সেজন্য ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য আমাদের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। তথাপি, পূর্তিকার ভূমিকা প্রসঙ্গে, ইহার মৌলিক তত্ত্বটির আভাস দেওয়া উচিত।

আমরা দেখিয়াছি যে, যম-নিয়মাদি অভ্যাসের সহায়ে সাধক যখন দেহাভিমান নিঃশেষে ত্যাগ করিয়া সর্বকামনা হইতে মুক্ত হন, তখন তিনি আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই ঘোষণা করিতে সমর্থ হন। তবে আর 'ব্রহ্মসম্পাদনের' আর কি বাকী রহিল,—এ প্রশ্ন উদয় হওয়া স্বাভাবিক। গীতা বলিতেছেন যে, তখনই ব্রহ্মসম্পাদন হইবে, যখন সাধক সর্বত্র সমদর্শন বা সর্বভূতের মধ্যে ঈশ্বরকে সমভাবে অবস্থিত দেখিতে পাইবেন[১৮]।

এই দুইটি উক্তির মধ্যে কিছু কিছু অসামঞ্জস্য নাই, পরন্তু, আত্মদর্শন এবং সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন একই সাধনার দুইটি অঙ্গ, যাহা যুগপৎ অনুশীলন করিতে হইবে এবং একটির ব্যতিরেকে অপরটিতে সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব নহে, কারণ ইহারা পরস্পরের পরিপূরক। অর্থাৎ, যখন নিজের মধ্যে এবং অপর সকলের মধ্যে ব্রহ্মকে সমানভাবে দেখিতে সক্ষম হইবেন তখনই সাধকের ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা মোক্ষসাধনার পূর্ণাহুতি হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের এই দ্বিমুখী ধারাকে একত্রিত করিয়া বলিয়াছেন—"আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"। অর্থাৎ, যাঁর হৃদয়ে আত্মার অবস্থিতি উপলব্ধি করিতে পারিলে সাধকের কামনা-বাসনার বন্ধন ছিন্ন হইয়া[৮৮] তাঁহাকে জীবন্মুক্তি দান করে, কিন্তু তথাপি তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান সম্পূর্ণ হয় নাই, কারণ ব্রহ্ম যেমন তাঁহার মধ্যে আছেন সেইরূপ তিনি সৃষ্ট সকল জীবের মধ্যেও অবস্থিত।[৮৯-৯০] অতএব ব্রহ্মদর্শন বা ব্রহ্মজ্ঞানকে সম্পূর্ণ করিয়া মোক্ষলাভ করিতে হইলে 'আমার মধ্যে যিনি সকলের মধ্যেও তিনি' এই উপলব্ধি প্রজ্ঞাভূত করিতে হইবে।[৯১-৯২] যিনি এই 'অপরোক্ষানুভূতি' লাভ করিতে সক্ষম হন, তিনি জন্মমৃত্যুরূপ সংসারচক্র হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন।[৯৩]

আমরা সৃষ্টিতত্ত্বে দেখিয়াছি যে, হিন্দুধর্ম মতে ব্রহ্ম একধারে সৃষ্টির কারণ ও উপাদান—তিনি নিজেকেই বিস্তৃত করিয়া বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন; সুতরাং সৃষ্ট প্রতিটি জীব তো দূরে থাকুক; জড় জগতের প্রতিটি অণুতেও তিনি বর্তমান। মানুষ ভেদবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া অর্থাৎ সেই সর্বব্যাপী ব্রহ্ম হইতে আমি পৃথক্ এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তাঁহাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু যে মুহূর্তে সাধকের ভেদবোধ চলিয়া যায় এবং আত্মস্বরূপ উপলব্ধ হয়, তখন তাঁহার সকল ভেদবুদ্ধি দূরীভূত হইয়া তিনি বহুর ভিতর একের প্রকাশ দেখিতে পান। তখন তিনি দেখিতে পান যে, তাঁহার কোনও পৃথক্ সত্তা নাই। তিনি অসীম চিৎসমুদ্রে একটি অবিচ্ছিন্ন বুদ্বুদের ন্যায়। সেই অনন্তরাশি সামগ্রিকরূপে ব্রহ্ম তাহার প্রতিটি কণাও ব্রহ্ম। পৃথক্-নাম ও উপাধি গ্রহণ করিয়া যে দেহটির অভিমানে তিনি অপরাপর জীব হইতে নিজেকে পৃথক্ মনে করিয়াছিলেন, তাহা অলীক; সেই বুদ্ধিই তাঁহাকে বিভিন্ন দেহে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছে।[৯৪] আজ তিনি 'অনিকেত'—আমার তাঁহার আশ্রয়টুকু পর্যন্ত নাই। আজ তিনি প্রকৃতই অনুভব করিলেন যে, পরিদৃশ্যমান জগতরাশির প্রতিটি কণার মধ্যে কোনও ব্যবধান নাই।

তিনি যাঁহাকে মন্দিরে, বিগ্রহরূপে উপাসনা করিতেছিলেন, সেই ব্রহ্ম বহুরূপে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছেন।[৯৫]

এই অবস্থায় আর দ্বৈত উপাসনার প্রয়োজন নাই। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'[৯৬] এই মহাবাক্যের তাৎপর্য সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া—কুক্কুরাদি নীচ জীব বা চণ্ডালাদি হীনবৃত্তি মনুষ্য যাহাদের তিনি এতদিন ঘৃণা করিয়াছেন—আজ তিনি অকপটচিত্তে তাহাদেরই চরণে প্রণত হইয়া তাহাদের উপাসনা বা সেবা করিয়া, 'সবই ব্রহ্মময়' এই তত্ত্বের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া নিঃসংশয় হইবেন।[৯৭]

অতএব 'অহং ব্রহ্মাস্মি'[৯৮] এই জ্ঞানলাভের পরও, জীবন্মুক্ত ব্যক্তি দেহত্যাগ পর্যন্ত লোকের কল্যাণ[৯৯] সাধনের জন্য জীবনধারণ করেন। তাঁহার নিজের কিছু কামনা নাই, এবং অপরে তাঁহার নিকট প্রার্থী না হইলেও, তিনি বসন্ত ঋতুর ন্যায়,[১০০] অযাচিতভাবে, সর্বজীবের সেবা করিয়া এবং তাহাদের দুঃখ দূর করিয়া সানন্দে জীবনকে উৎসর্গ করেন। যতক্ষণ এই লোকসেবা গ্রহণ না করেন ততক্ষণ ভগবৎপ্রাপ্তি সম্পূর্ণ হইবে না; কারণ যাহার আপন পর বোধ আছে, তাহার তো ঐকান্ত্যবোধ হয় নাই।[১০১] যখন ঐ ভেদবুদ্ধি দূর হইবে তখনই লোকে অপরের দুঃখে নিজের দুঃখের ন্যায় ব্যথিত হইতে পারে।[১০২]

জানা করা যায়, এতক্ষণে এই পুস্তকের বিষয়বস্তুর পরিধি পরিষ্কার হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ইহাতে গীত হইয়াছে মাত্র একটি গান—মানুষের ব্রহ্মত্বে অধিরোহণ—'ঐশ্বর সন্ ব্রহ্মাপোহি'।[২১] অন্য যাহা কিছু বলা হইবে, তাহা ঐ গানটিরই আলাপ তান, বিস্তারাধিক্যমাত্র। কারণ, ঐ গানটি আয়ত্ত হইলে আর তো কিছু গাহিবার প্রয়োজন হইবে না। অমৃতলোকের মহামন্ত্রের সন্ধান যে একবার পাইয়াছে, সে কি আর অন্য কথায়[২২] বাচালতা করিবে? সব জানার জানি ও অন্ত যিনি, তাঁহাকে যদি জানা হইয়া যায়, তারপরে কি আর অন্য কিছু জানিবার প্রয়োজন আছে?[২৩] তাঁহাকে জানিলেই তো সব জানা হইয়া যায়।[২৪]

পরিশেষে নিবেদন এই যে, হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে নূতন কিছু বলিবার ক্ষেত্র বা সুযোগ নাই কারণ যুগ যুগ ধরিয়া ত্রিকালজ্ঞ ঋষি ও মহাপুরুষগণ সর্ববিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা ইহার প্রতিটি তথ্যের আদ্যোপান্ত বিচার, সমীক্ষা এবং প্রত্যালোচন করিয়া গিয়াছেন। লেখকের একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে সেইসকল তথ্যের ন্যূনতম, সর্বজনগ্রাহ্য সার সঙ্কলন করিয়া হিন্দু সাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করা। প্রারম্ভেই বলিয়াছি, কাহাকেও ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেবার সামর্থ্য দূরে থাকুক স্পর্দ্ধাও আমার নাই। পরিশেষে বক্তব্য, ইহা বেদান্ত দর্শনের ভাষ্য নহে, বিশাল হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব পরিবেশনের প্রয়াস মাত্র।　　(ক্রমশঃ)

২১। শ্বেঃ (১।৬-১২)— '... পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চমত্বা ... ব্রহ্মমেতৎ'।

২২। ভাঃ (১২।৩।৮-১২)— 'ন ভত্রাত্মা ... পৃথগাত্মনঃ'।

২৩। কঃ (১।২।১৮); গীঃ (২।২৩)— 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা ... আত্মা হ্নতোঽয়ম্'।

২৪। সর্ব্বসারোপনিষৎ (১)— দেহাদীনাত্মত্বেনাভিমন্যতে কঃ (২।৩।১৪)— 'তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি ...'।

২৫। মহাঃ (কর্ণপর্ব, ৪১।৩৭; ৬৯।৫৯)— 'ধারণাদ্ ধর্মমিত্যাহুর্ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ'।

২৬। অথঃ (১১।১।১)— 'সত্যং বৃহদৃতম্ ... পৃথিবীং ধারয়ন্তি'।

২৭। বৃঃ (১।৩।২৮)— '... মৃত্যোর্মাঽমৃতংগময়' ; মুঃ (৩।২।১)— '... বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি' ; শ্বেঃ (১।৬।১১)—'সর্বাজীবে আত্মকামঃ' ; কঃ (১।১।৮)— '... তৎসমাপ্নোতি মৃত্যুঃ তুরো ন জায়তে' ; (২।৩।১৪-১৫)— ... অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনম্'।

২৮। কঃ (১।৩।১৫)—'অশব্দম্ ... মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে' ; (২।৩।৮-১)— '... যং জ্ঞাত্বা'...অমৃতত্বায় ভবতি' ; কে (২।৫)—'ইহচেদবেদীথ ... অমৃতা ভবন্তি' ; শ্বেঃ (৩।৭-৮)— তং জ্ঞাত্বাঽমৃতা ভবন্তি' মৃত্যুমেতি ... অয়নায়।'

২৯। কঃ (২।৩।১৮)— '... ব্রহ্মপ্রাপ্তো অভয়ন্নিরুক্ত্যা ...' ; মুঃ (৩।২।৫-৭)—'সং প্রাপ্যৈনম্ ... ভবতি', গীঃ (৮।১৫-১৬)—মামুপেত্য ... পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।'

৩০। শ্বেঃ (২।১৫)— '... সর্বভূতৈর্বিগূঢ়ং ... (৬।১১)—'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং অমৃতস্য পরং ...', কঃ (২।১।১৩)—তদ্ধে তদ্বমাদিতঃ

৩১। ব্রহ্ম 'জ্ঞান' ও ব্রহ্ম'প্রাপ্তি' পৃথক্ বোধ নহে, কারণ যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মের তায়ই হন (মুঃ ৩।২।৯ '... ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি ...' ; বৃঃ (৪।৪।২৫)— '... ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ'। তৈঃ ২।১।১ 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্ ... ; ঋ (১।৭-৮)—ব্রহ্মবিদোবিদিত্বা ... মৃত্যুতে সর্বপাশৈঃ।' কৌষিঃ (১।৪)— '... ব্রহ্মবিদাম্

ব্রহ্মবাহিতৈতি।' আবার, ব্রহ্মের তার শুদ্ধ না হইলে 'ব্রহ্মজ্ঞান' বা 'আমিই সেই ব্রহ্ম' এই আত্মজ্ঞান উদিত হইতে না বা নিজের স্বরূপ জানা যায় না (মুঃ ৩।১।৩—'সত্ত্বেন … জীবধোযাঃ' ; ৩।১।৮-৯—'ন চক্ষুষা … বিশুদ্ধেন আত্মা' ; বৃঃ ১।৪।১০— … তদাত্মনমেবাবেৎ। অহং ব্রহ্মাস্মীতি … ।'

১৫। বৃঃ (৪।৬।৫) ; মুঃ (ঐ—৫।১)।

৩২। অনেকের মতে, ভক্তিমার্গে মোক্ষ বা ব্রহ্ম প্রাপ্তি সাধকের উদ্দেশ্য নহে। এই পুস্তকের নানা স্থানে, এই ধারণা যে ভ্রান্ত তাহা দেখান হইয়াছে। ভক্ত মোক্ষ আকাঙ্ক্ষা করেন না ইহা সত্য হইলেও, ত্রিগুণ মুক্ত না হইলে ভগবৎ-কৃপা লাভ করা যায় না [ভাঃ ১১।১৫।৩৩-৩৬] '… ত্রৈগুর্যমুক্তো … জীবন্নির্মুক্তো … মরণস্য ব্রহ্মণা পূর্বো …] এবং ঐ স্তরে পৌঁছাইতে পারিলে, অব্যভিচারভাবে সাধকের পুনর্জন্ম হইতে মুক্তি হইবে, কারণ—ঐরূপ ত্রিগুণমুক্ত ব্যক্তি ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন [ভাঃ ১১।২৫।৩২ — '… নির্জিতাঃ সৌম্যমদ্ভাবায় প্রপন্নাঃ।' ইহাই উপনিষদ্‌উক্ত 'ব্রহ্মাপায়' বা গীতার 'ব্রহ্মভূত' অবস্থা। সুতরাং ভক্তিমার্গেও চরম পরিণতি 'মুক্তি' [ভাঃ (১২।১৩।১৮-২১)— '… ভক্ত্যা বিষ্ণুরোধ্যরঃ … বিষ্ণুরাতমমুমুচৎ']। অধিক কি, মোক্ষলাভের সহায়তার জন্যই ভাগবত রচনা করিয়াছেন, ইহা ভাগবত রচয়িতা ব্যাসদেবেরই উক্তি [ভাঃ (১।৩।৪৩)—'ইদং ভাগবতং ব্রহ্ম-সম্মিতম্ … নিঃশ্রেয়সায় লোকস্য … ।'

৩৩। কারণ, দুইটি বস্তু সমভাবাপন্ন না হইলে সম্পূর্ণরূপে মিলিত হইতে পারে না। যেমন—শুষ্ক-জলের সহিত শুষ্কজলের (কঃ—২।১।১৫-১৫ 'যথোদকং … আত্মা ভবতি …') বা নদীর সহিত সমুদ্রের (মুঃ ৩।২।৮ —'যথা নদ্যঃ … বিদ্বান্' ; প্রশ্ন—৬।৫) মিলন। সেইরূপ মানুষকে ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইতে হইলে ব্রহ্মের 'সাযুজ্য', অর্থাৎ ব্রহ্মের ভাব বা সাদৃশ্য লাভ করিতে হইবে। [মুঃ (৩।২।৯)— '… ব্রহ্মৈব ভবতি … বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি']।

৩৪। বৃঃ (১।৪।১০)— '… যোঽন্যাং দেবতা মুপাস্তে … ন স বেদ …' মুঃ (১।২।২২)—'পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন'। যজ্ঞ—তপস্যাদি আত্মিক বিকাশের সহায়ক সন্দেহ নাই [শ্বেঃ ৬।৩)—'তৎকর্ম … মুমুক্ষুঃ] কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত মুক্তিলাভ হইবে না। বৃঃ (৪।৪।২২— '… যজ্ঞেন দানেন … মুনির্ভবতি' ; শ্বেঃ (৪।৮) … যস্তং ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি']। ব্যক্তিগত পূজাদির দ্বারা কাম্যলাভ, পুণ্যলাভ, স্বর্গলাভও হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের ক্ষয় আছে [বিষ্ণু (৬।৫৩)— '…স্বর্গেঽপি—পাতশ্চাভক্ত…'] ব্রহ্মপ্রাপ্তি ব্যতীত মোক্ষপ্রাপ্তি হয় না গীঃ (৩।১২) —কাঙ্ক্ষন্তঃ দেবতাঃ …', (৯।২৩-২৪)—'যেঽপ্যন্য দেবতাভক্তা যজন্তি শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ', ৪।২৪—ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মকর্ম সমাধিনা', ২।৪১-৪৩—'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি কর্মফলপ্রধান্ … ' ৯।২০-২১—'ত্রৈবিদ্যা … ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি' …, ৮।১৬—'আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ … পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে'], ভাঃ ৩।১৫।৪১)—'কর্মবল্লীমবলম্ব্য…পতন্তোঽপি (১১।১০।২৬)—'ভাবে … কালচাবিদঃ' (৩।২৯।২৫ —অর্চাদাবর্চয়েত্তাবৎ যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব-ভূতেষবস্থিতম্। মনু (১২।৮৩-৮৫)—'বেদাভ্যাসস্তপো … ক্ষয়ত্বং তস্যঃ, (১০৪)— '… তপসা কিল্বিষং হন্তি বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে' (১২৫)—'এবং যঃ … পরং পদম্'।

এমন কি, তন্ত্রশাস্ত্রের অন্যতম প্রধান গ্রন্থ মহানির্বাণতন্ত্র—'কলিতে বেদমন্ত্র নিষ্ফল এবং তন্ত্রই একমাত্র সাধনা' (২।৭, ১৪-২০) বলিলেও, ব্রহ্মোপাসনা ব্যতীত মোক্ষলাভ হইবে না এবং তাহার জন্য কোনও আচার, নিয়ম, উপচার, উপবাসের প্রয়োজন নাই, তাহা স্বার্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন (২।৩৩, ৩২ ৫৫)। সত্য জপ, হোম উপবাসে মুক্তি হয় না—একমাত্র 'আমিই ব্রহ্ম' এই জ্ঞান হইলে তবে মুক্তিলাভ হয়—'ন মুক্তির্জপনাদ্ধোমাদ্-

পবাদনভৈরবি। ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি নেতরঃ' ॥ —(১৪।১১১) চতুর্দশ উল্লাসের ১১১ হইতে ১২৪-এর প্রতিটি শ্লোককে উপনিষদ্ তথা হিন্দুধর্মের নির্যাস বলা যাইতে পারে।

৩৬। বৃঃ (৪।৩।৩)—'স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম ···' ; কঃ (২।২।১২-১৩) ; শ্বেঃ (৬।১২)— '··· তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ···' ; ছাঃ (৮।৭।৪)— '···আত্মেতি ··· এতদ্ ব্রহ্ম ···' ; মুঃ (২।২।৭) '··· দিব্যো ব্রহ্মপুরে ··· আত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ'।

৩৮। ছাঃ (৮।৩।৪ ; ৮।১২।৩)— '··· যেন রূপেন অভিনিষ্পদ্যতে ···' ; বৃঃ (৪।৪।২২-২৩)— 'স বা এষ মহানজ আত্মা এষোঽহন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিঞ্ছেতে ··· তমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি আত্মনোবাত্মানং পশ্যন্তি ··· ব্রহ্ম ভবতি স এবং বেদ'।

৩৮-ক। গীঃ (১৪।২) ··· 'মম সাধর্ম্যমাগতাঃ' ; ভাঃ (৩।১২।২৭) 'প্রজাপাস্যেবাস্থনস্তদোত্থমবিশেষণ সমীক্ষ্যঃ।'

৩৭। (১।৩)— '··· স্বরূপেঽবস্থানম্' ; (৪।৩৪)—'স্ব-রূপ-প্রতিষ্ঠা' দ্র. (৬।৪।৭) ; কঃ ; (১।৩।১০-১১)—'যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে ··· এতাবদ্ধ্যনুশাসনম্' ; ভাঃ (২।১০।৬)—'যুক্তিহিরণ্যগর্ভস্য রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ' (১।৩।৩৪)—'··· মহিম্নি।'

৩৮। বৃঃ (৪।৪।৪)— '··· যথাচারী তথা ভবতি ··· ।'

৩৯। গীঃ (১৬।২-৪)—'অহিংসা ··· আসুরীম্'। [সদাচারের দ্বারা ইহলোক এবং পরলোকে কি কি শ্রেয়োলাভ হয়, তাহা মহাভারতে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে (অনুশাসন, ১০৪।৫-৯, ১৫৯-৬]।

৪০। গীঃ (১৬।৩)—'দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় ··· মতা'।

৪১। তৈঃ (শিক্ষাবল্লী ১১।১।২)—'অনুচরিতানি ··· তদুপাস্যানি।'

৪২। যথা,—এক দেশে যাহা অভক্ষ্য, অন্য দেশে তাহা অত্যুত্তমে বা অন্য খাদ্যের অভাবে, ভক্ষ্য হইতে পারে, যেরূপ বিবাহ (যথা, মহাভারত যুগের স্বয়ম্বর) বা যে কন্যার সহিত বিবাহ এক যুগে বা একদেশে বৈধ বা নিষিদ্ধ ছিল তাহা অন্যত্র অবৈধ বা প্রশস্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

৪৩। মনুঃ (১।১০৮-১১০ ; ২।৬, ১২)।

৪৪। মনুঃ (২।১৮)—'তস্মিন্ দেশে ··· সদাচার উচ্যতে।'

৪৫। মনুঃ (১।৯৭)—'ব্রহ্মবেদিনঃ ; (১২।১৫৪)— '··· বিদুরাত্মগতম্ বুধে।'

৪৬। মনুঃ (১২।৯২)—'যথোক্তান্যপি ··· আত্মজ্ঞানে ··· যত্নবান্।'

৪৭। মনুঃ (১২।৯৪-৯৬)—'পিতৃদেব মনুষ্যাণাং ··· নিষ্ফলান্যসৃতানি চ।'

৪৮। মনুঃ (১২।১০৬)— বেদশাস্ত্র বিরোধিনা নেতরঃ' (২।১২-১৩)— 'বেদঃ প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ।'

৪৯। তৈঃ (১।১১।৩ ৪)—'অথ ··· মৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ ··· যথা তে তেষু বর্তেরন্' ··· বর্তেথাঃ।'

৫০। বিষ্ণুপুরাণে, নিষ্পাপ সাধুব্যক্তির আচরণকেই সদাচার বলা হইয়াছে—'সাধবঃ ক্ষীণদোষাস্তু ··· স উচ্যতে' (৩।১১।৩)।

৫১। দ্রঃ বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলী (উদ্বোধন), ৩।৬৩-৪।

৫২। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মনুর সময়ে কন্যার বিবাহে কন্যার পিতা বরপক্ষ হইতে পণ বা 'শুল্ক' গ্রহণ করিতেন ; এই কু প্রথা বন্ধ করিবার জন্য মনু ইহাকে 'অপত্যবিক্রয়' অভিহিত করিয়া

এবং পাপ বলিয়া নিন্দিত করিয়াছেন [মনু—৩।৫১-৫২ 'ন কন্যায়াঃ পিতা ... যাচ্ঞাযোগমিম্ ; ৯।৯৮]। কিন্তু মনুসংহিতায় বরের পিতার অনুরূপ পণগ্রহণ সম্বন্ধে কোনও অনুশাসন নাই, কারণ তৎকালীন সমাজে বরপণের ঐরূপ প্রাদুর্ভাব ছিল না। তাই বলিয়া একথা মনে করিলে ধর্মহানি হইবে যে, বরপণ লওয়া হিন্দুধর্মে সদাচার, কারণ কন্যার বিবাহে শুল্ক লইলে, যদি 'অপত্যবিক্রয়' হয় তাহা হইলে, অনুরূপ কার্যে পুত্রের পিতারও 'অপত্যবিক্রয়' রূপ পাপ হইবে।

অপরদিকে, সত্যনিষ্ঠা 'ধর্মমূল' হইলেও 'অপ্রিয়' সত্যভাষণ সদাচার হইবে না [মনুঃ—৪।১৩৮]। মহাভারত নিজের প্রাণরক্ষার জন্য মিথ্যাভাষণ অধর্ম বলিয়াছেন (মঃ ভাঃ, শান্তি—১১০।১১), কিন্তু অপরের প্রাণরক্ষার জন্য মিথ্যার আশ্রয়কে অনুমোদন করিয়াছেন [কর্ণ ৬৯।২৩, ৩৭, ৬০—প্রাণিনামবধস্তাত সত্যাৎ ... যদেবং বাচং ...']। কারণ, জীবগণকে যাহা 'ধারণ' বা রক্ষা করে, তাহাই তো ধর্ম [কর্ণ—৬৯।৫৮]।

৫৩। গীঃ (২।৭২)—'এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ ... ব্রহ্মনির্বাণ মৃচ্ছতি' ; কৌঃ (১।৪) বিমুক্তস্তো ব্রহ্মবিদ্যান্ ঋষৈষাদিভিঃ' ; ভাঃ (৩।২৭।২৬-২৯)—'এবং বিদিততত্ত্বস্য ... কৈবল্যাখ্যং মদাশ্রয়ম্ ... মদ্ভাবো ন নিবর্ত্তেত।'

৫৪। ছাঃ (২।১৩।১)—'ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধা ভাঃ (১১।২৩।২১-২২)—'উপর্যুপরি গচ্ছান্ত সত্ত্বেন ... মর্যাদি ... ।'

৫৫। গীঃ (৯।২০-২১)—'ত্রৈবিদ্যা ... তে যান্তি ভূয়ঃ' স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি ; ভাঃ (৩।১৪।৪১)—কর্মণাম্নীমলম্বা পুনরশ্নোবং নরলোকসার্থমুপযাতি (১১।১০।২৬)—'তাবৎ স মোদতে স্বর্গে ... ক্ষীণ পুণ্য ... ।'

৫৬। গীঃ (৮।২০, ২৫)।

৫৭। গীঃ (৩।২৫, ৬।৩১)।

৫৮। গীঃ (১৩।২৭-৩০)—'সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ ... ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা।'

৫৮ ক। মুঃ (২।২।৭-৮)—'যঃ সর্বজ্ঞঃ ... ব্রহ্মপুরে ... প্রতিষ্ঠিতঃ ... অস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।'

৫৯। শ্বেঃ (৬।১১)—'... সর্বভূত গুহাশয়ঃ ... সর্বগঃ শিবঃ', (৪।১৫)—'সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ।'

৬০। কঃ (২।২।১০-১২)—'...সর্বভূতাত্মভূতাত্মা...তমাত্মস্থং যে ধনু পশ্যন্তি ... তেষাং সুখং শাশ্বতং ... ।'

৬১। কেঃ (২।৩)—'... ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ... অমৃতা ভবন্তি।'

৬২। কঃ (২।১।১৪-১৫)—'যথোদকং ... শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।'

৬৩। শ্বেঃ (৪।১৩-১৭)—'সো দেবানামাধিপো ... জ্ঞাত্বা শিবং সর্বভূতেষু গূঢ়ং ... এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।'

৬৪। ছাঃ (৩।১৪।১)—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ... ।'

৬৫। ভাঃ (১১।২৯।১৩-১৮)—'ইতি সর্বাণি ভূতানি ... প্রণমেদ্ দণ্ডবদ্ ভূমৌ ... সর্বং ব্রহ্মাত্মকং ... মৃতসংসৃতিঃ'।

৬৬। মুঃ (১।৪।১০)।

৬৭। ভাঃ (১।৪।১২)—'শিবায় লোকস্য ... ভাবয়ন্তি নাত্মার্থম্ ... ।'

৬৮। মঃ বিঃ (৩৭-৩৮)—'... বলভদ্রোকবিষ্ণুং চরন্তম্ ... শুদ্ধ এব যং পরমাপনোদ প্রবণম্ ... অবধি কিঞ্চিৎ কিল ।'

৬। গী: (৬।২৯-৩১)—'সর্বভূতস্থমাত্মানং ... যো মাং পশ্যতি সর্বত্র ... সর্বভূতেষু ... ময়ি পশ্যতি।'

৭০। গী: (৬।৩২)—'আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি ...

৭১। ঈ: (৪।৪৬)।

৭২। মু: (২।২।৩)—'... তমেবৈকং জানথ ... অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ ধীরো বিজ্ঞায়...নানুধ্যানাদ্ বহূঞ্ছব্দান্ ...', মু: (৩।১।৪)—'বিদ্বান্ ভবতে নাবিদ্বান্।'

৭৩। গী: (১০।৪২)—'অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন ...।'

৭৪। ছা: (৬।১।৩)—'যেনাশ্রুতং শ্রুতং ... অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি বৃহ: (১।৪।৭)—'অনেন জ্ঞাতেন সর্বং বেদ ...।'

—:o:—

পাশ্চাত্য ও ভারতীয় জীবন ভাবনা

শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

আজ থেকে প্রায় ২৭।২৮ বছর আগে কোলকাতার চৌরঙ্গীতে USIS লাইব্রেরী হলে নীতিশাস্ত্র বিষয়ে একটি আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ ও দু'জন মার্কিন অধ্যাপক ঐ চক্রে বক্তার আসনে ছিলেন। কোলকাতার বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার কর্মীবৃন্দকে শ্রোতার আসনে ঐ চক্রে আমন্ত্রণ করা হয়। ঐ আলোচনার প্রসঙ্গে বিভিন্ন বক্তাদের মধ্যে একজন মার্কিন অধ্যাপক ভারতীয় নৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে যে প্রশ্নটি উত্থাপন করেছিলেন সেই একই প্রশ্ন অন্যভাবে একজন ইংরাজ সাংবাদিক ১৮৯৬ সালে স্বামী বিবেকানন্দের নিকট উত্থাপন করেন। ঐ প্রশ্ন থেকে বোঝা যায় যে, পাশ্চাত্যবাসীর মনে ভারতীয় জীবনাদর্শ সম্বন্ধে একটি ভ্রান্তিমূলক ধারণা আজও রয়ে গেছে।

স্বামীজির কাছে যে প্রশ্ন করা হয় তা হচ্ছে—"আমার মনে হয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানের মধ্যে একটা পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি। আপনারা সন্ন্যাস মনঃসংযোগ ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যক্তি জীবনকে নিখুঁতরূপে গড়ে তুলতে চান, আর পাশ্চাত্যের লক্ষ্য সামাজিক অবস্থাকে নিখুঁত করে তোলা, তাই আমরা রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক লক্ষ্য রেখেই কাজ করি, কারণ আমরা মনে করি সাধারণ মানুষের মঙ্গলের ওপর আমাদের সভ্যতার স্থায়িত্ব নির্ভর করে।" (শ্রীগোপাল হালদার সম্পাদিত "বিবেকানন্দ রচনা সংগ্রহ" ইং ১৯৭৮ সংস্করণ, ৮ম খণ্ডের "আলোচনা ও বক্তৃতা" অধ্যায়ের ৩৩২ পাতা)। ঐ পুস্তকের ঐ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত স্বামীজির উত্তর—"কিন্তু সামাজিক অথবা রাজনৈতিক সব রীতিনীতির ভিত্তি মানুষের সভ্যতার ওপর নির্ভর করে। আইন সভা কি কি আইন তৈরী করে তার ওপর কোন জাতির বড় হওয়া অথবা সৎ হওয়া নির্ভর করে না, নির্ভর করে তার মানুষগুলি মহৎ অথবা সৎ কিনা তার ওপর। আমি চীন দেশ পরিভ্রমণ করেছি। চীনের সংগঠন আর সব জাতির মধ্যে খুবই প্রশংসনীয়। তবু আজও চীনারা অসংশোধিত অনড়, কারণ তার পুরনো দিনের উদ্ভাবিত রীতির সমতুল নয় চীনের লোকেরা। ধর্ম বিষয়ের সেকথা পর্যন্ত যায়। তা যদি ঠিক হয়, তবে আর সবই ঠিক। ..... খ্রীষ্ট দেখেছিলেন, নৈতিকতা ও পবিত্রতাই একমাত্র শক্তি, আইন নয়। আপনার

বিবৃতি অনুযায়ী তারা ব্যক্তির উচ্চতর আত্মবিকাশের লক্ষ্যে ও পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থাকে নিখুঁতভাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পৌঁছতে চায়, আপনি নিশ্চয়ই বুঝবেন না যে, একটি বস্তু সত্তা ও একটি প্রকৃত সত্তা।"

আমার ইং ১৯৫৪/১৯৫৫ সালের ঐ আলোচনা চক্রে মার্কিন অধ্যাপকের প্রশ্নটি যে ঠাঁচটি এইরকম ছিল—"রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, পাশ্চাত্যবাসীরা ক্রমাগত সমাজজীবনে সুসংহত ও সুগঠিত হবার পথে অগ্রসরমান কিন্তু ভারতীয়রা ক্রমাগত আত্মমোক্ষার্থে সমাজজীবন থেকে মুক্তিলাভে আগ্রহী।" তারপরই তিনি প্রশ্ন করেন—"এই দুটি বিপরীত ধারার সামঞ্জস্য কি সম্ভব?" এই প্রশ্নের উত্তরে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ডক্টর উপাধিধারী অধ্যাপক উত্তর করেন—"ভারতীয় নীতি শাস্ত্রের আদর্শ transcendent। সুতরাং ভারতীয় নৈতিক আদর্শ জগৎমুখী নয়, ওটা মোক্ষমুখী। তাই ভারতীয় জীবনের চরম আদর্শ হল আত্মমোক্ষ।"

স্বামীজীর ঐ উত্তরের মধ্যে উক্ত অধ্যাপকের উত্তরের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত থাকলেও তাঁর মূল বক্তব্য ছিল যে, ব্যক্তির ব্যক্তিগত আত্মোন্নতি না হলে, মানুষ ব্যক্তিগত ভাবে সৎ ও পবিত্র না হলে, কোন সমাজ বা জাতি বাহ্যিক আইন ও উন্নত রাষ্ট্রীয় বা সমাজ ভাবনার দ্বারা সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। কাজেই ব্যক্তিগত চরিত্র গঠনের শিক্ষা সর্বাগ্রে সভ্যতার লক্ষ্য হওয়া বিধেয়।

স্বামীজী তাঁর প্রশ্নকারীর মনের ভাব বুঝে হয়ত যথাযথ উত্তর দানের চেষ্টা করেছেন কিন্তু নীতিশাস্ত্রের ঐ সেমিনারে মার্কিন অধ্যাপক মশাই ভারতীয় জীবনাদর্শের প্রতি যেন কটাক্ষপাত করেছেন, আমার মনে হয়। তাঁর বক্তব্য যেন এই যে ভারতীয় জীবনাদর্শ নীতিশাস্ত্র ভিত্তিক নয়, তা হচ্ছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক আত্মসাধনা যার লক্ষ্য সমাজ নয়, বরং আত্মমোক্ষ এবং সেই অর্থে অনৈতিক অর্থাৎ immoral না হলেও amoral বা supra-ethical। আমার আরও মনে হল যে, আমাদের অধ্যাপক মশায়ের উত্তর ভারতীয় জীবন ভাবনাকে যথাযথ প্রকাশ করতে পারে নি এবং পাশ্চাত্য ও ভারতীয় জীবনাদর্শে কোথায় সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য তাদে তা যথাযথ ব্যাখ্যা করে নি। সুতরাং উত্তরের সামঞ্জস্য সম্ভব কিনা তার সদুত্তর পাওয়া গেল না যদিও প্রশ্নকর্তা এই সামঞ্জস্যের প্রশ্ন তোলেন।

শ্রোতার আসনে থেকেও অসহিষ্ণু হয়ে আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যে উত্তর দান করি তা মূলতঃ হচ্ছে এই—"ভারতীয় নৈতিক আদর্শ বস্তুতঃ Immanent ও transcendent উভয়ই। ইহা শুধু আত্মমোক্ষায় নয় অপরিচিতায় ও। আমাদের প্রচলিত একটি গল্প ভারতীয় জীবনাদর্শকে পরিষ্কার ব্যাখ্যা করেছে—

এক পথিক এক রাত্রে একটি গাছের তলায় আশ্রয় নিল। শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্য সে আগুন জ্বালাল। পথিক ক্ষুধার্ত হয়েও নিকটে কোথাও খাদ্যের সন্ধান পেল না। ঐ গাছে এক পক্ষী ও পক্ষিণীর বাসা ছিল। পক্ষী ও পক্ষিণী ভাবল যে, ঐ পথিক তাদের গৃহাগত অতিথি ও তার সেবা-যত্ন তাদেরই কর্তব্য। পক্ষী স্থির করল যে, আগুনে আত্মাহুতি দিয়ে পথিকের আহারের ব্যবস্থা করবে। পক্ষিণীও স্বামীকে অনুসরনের সিদ্ধান্ত স্থির ক'রে উভয়েই ঐ আগুনে আত্মাহুতি দিয়ে পথিকের আহারের সুযোগ ক'রে দিল। এই কাহিনী ভারতীয় জীবনাদর্শের অনন্য ব্যাখ্যা ও চরম দৃষ্টান্ত এবং সমাজজীবনে কর্তব্য পালনের জন্য আত্মাহুতির অনুপ্রেরণা। ভারতীয় জীবনাদর্শ সমাজজীবনকে চতুরাশ্রমে ভাগ করেছে—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। জীবনের একসময়ে গুরুগৃহে বিদ্যাচর্চা, তারপর সংসার ও সমাজজীবন এবং তারপর নির্জনবাসে আত্মমোক্ষের সাধনা করাই ভারতীয় জীবনাদর্শ। ভারতীয় জীবন ভাবনায় সমাজ ও ব্যক্তি কল্যাণ উভয়ই স্থান লাভ করেছে।"

গার্হস্থ জীবনযাপনকালে সমাজ কল্যাণের কারণে আত্মাহুতি দানের চরম আহ্বান যদি কারও জীবনে দৈবক্রমে না আসে তাহলে জীবনের একসময়ে সমাজ কল্যাণ সাধন করে পরবর্তীকালে আত্মকল্যাণের

অন্ত আত্মমোক্ষার নিজেকে নিয়োগ করার শিক্ষাই ভারতীয় মনীষীগণ প্রচার করেছেন। এই শিক্ষা সমাজ-জীবনকে ত্যাগ করে নি কিন্তু পাশ্চাত্য ভাবনার মত আত্যন্তিক সমাজজীবনের কারাবরণে নারাজ। তাই ভারতীয় জীবনাদর্শ immanent ও transcendent. পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের সঙ্গে তাই ভারতীয় নৈতিক জীবনের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই বর্তমান।

ভারতের জীবন ভাবনা সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের এই ভ্রান্তিমূলক ধারণা এই সেদিনেও একজন রুশ অধ্যাপক ও একজন মার্কিন অধ্যাপক যথাক্রমে মনামবন্ত এস ওক্তি বেবাতের ও মহাসামন্তের নিকট প্রকাশ করেছেন।

আমার ধারণায় দুটি সভ্যতার পার্থক্য হচ্ছে পাশ্চাত্যের এই ভ্রান্তিমূলক ধারণার ভিত্তি। ভারতীয় সভ্যতা মূলতঃ অধ্যাত্মবাদী আর পাশ্চাত্য সভ্যতা মূলতঃ জড়বাদী। পাশ্চাত্য সভ্যতায় তাই ঐহিক ও ঐহিক কল্যাণ চিন্তা ও ভারতীয় সভ্যতায় তাই আধ্যাত্মিক ও পারত্রিক কল্যাণ চিন্তা প্রাধান্য লাভ করেছে। অর্থ কিন্তু এই নয় যে, আধ্যাত্মিক কল্যাণ ঐহিক কল্যাণকে পূর্ণতঃ বর্জন করে—যে শুধু নিছক ঐহিক সুখের কারাবরণে নারাজ। তাই যদি না হত, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধে উৎসাহ না দিয়ে আত্মমোক্ষে উৎসাহ দিতেন এবং স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন না যে দারিদ্র্যই যদি ঈশ্বরলাভের উপায় হত তবে ভিক্ষুকেরা সবাই মুক্ত হয়ে যেত।

একমাত্র আধ্যাত্মিক সভ্যতাই ভোগমুখী সভ্যতার স্বার্থপরতাকে দূর করে, মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব ও দেবত্ব বিকাশ করে, মানুষকে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বে উদ্বুদ্ধ করে এবং বিশ্বে স্থায়ী কল্যাণ সাধন করে। এই সভ্যতাই পাশ্চাত্য চিন্তার World family বা Citizen of the world-এর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে পারে। মানুষ ঈশ্বরের মতই শক্তিমান কিন্তু সে ঈশ্বরের মত পবিত্র নয়—এখানেই পার্থক্য। জড়বাদী ও অধ্যাত্মবাদী সভ্যতার পার্থক্যও অনুরূপ। ভারতীয় অন্তর্দর্শনের কাছে জীবন তার আসল চেহারাটা লুকিয়ে রাখতে পারেনি এবং সেদিক থেকে ভারতীয় জীবন ভাবনা অনেক বাস্তববাদী। ভারত মনীষা ঠিকই সিদ্ধান্ত করেছে অধ্যাত্ম চিন্তাশূন্য ভোগ-বাদী সভ্যতা ইন্দ্রিয় সুখের পাশবিক লোলুপতা বৃদ্ধি করে মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে দ্বেষ ও অপ্রয়োজনীয় প্রতিযোগিতা ও প্রতিহিংসাকে প্রতিষ্ঠিত করে ও সভ্যতাকে ধ্বংস করে। বর্তমান সভ্যতার চেহারা স্বামী বিবেকানন্দের চোখে ঠিক এইরকম—

"অধিকাংশ মানুষই এই রক্ত মাংসের গন্ডীর আর ইন্দ্রিয় সুখের চেয়ে বেশী কিছু ভাবতেই পারে না। ... তারা পশুর মাংস খায়। তারা তাদের শিশুদের ভালবাসে। মানুষের কাছেও কি এই শুধু অস্তিত্বের মাপকাঠি। আমরা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপাসনা করি। কেন করি? আমাদের যাতে তিনি পার্থিব বস্তু দেন ও সেগুলি সবসময় সংরক্ষণ করেন—এর অর্থ পশুপাখির চেয়ে আমরা খুব একটা উন্নত নই। আমরা এর চেয়ে বেশী কিছু আছে বলে জানি না। একি বিপর্যয়, আমাদের আরও বেশী জানা উচিত। পার্থক্য শুধু এই যে, পশুদের আমাদের মত ঈশ্বর নেই ...।" (উক্ত—"বিবেকানন্দ রচনা সংগ্রহ" ২১৮ পৃঃ ৮ম খণ্ড ১ম সংস্করণ।)

আমাদের যা কিছু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার তার প্রয়োগ ক্ষেত্রের সবটাই প্রায় ইন্দ্রিয় সুখের বিস্তারকল্পে আর যা কিছু দার্শনিক গবেষণা তা শুধু তথাকথিত বুদ্ধিচর্চাকল্পে, আমাদের ব্যবহারিক জীবনে তা জীবন চর্যার রূপ নিতে পারে নি। স্বামীজি তাই বলের বেদান্তকে গৃহে প্রতিষ্ঠা করার বাণী প্রচার করেছেন। এখন প্রশ্ন হতে পারে মানুষের কি এ জাতীয় উন্নতি সম্ভব যার দ্বারা পৃথিবী দেবভূমিতে পরিণত হতে পারে? আনুষঙ্গিককালে আমাদের প্রত্যাশা হল বিজ্ঞান—যেদিকে এখন আমরা আদৌ দিই না। সেই বিজ্ঞানই

বলে যে, পৃথিবীর জীবজগতে ক্রমবিকাশের ইতিহাস আছে। ঐ ধারা থেকে যদি জড় থেকে প্রাণে, প্রাণ থেকে উদ্ভিদ প্রাণীতে এবং উদ্ভিদ প্রাণী থেকে উন্নত মানুষে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হয় তবে মানুষ থেকে অতি মানুষের বিকাশ কি অসম্ভব চিন্তা। বিবর্তনের ধারা কি মানুষ সৃষ্টি ক'রেই থেমে গেছে? তাই যদি হয় ঈশা, মুসা, বুদ্ধ চৈতন্য, রামকৃষ্ণ ইত্যাদি এলেন কোথা থেকে? আবার পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ্‌গণ যথা: Wilkie, Grotius প্রভৃতি 'one world', International Law প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখেন কি ক'রে? Louis Wirth কি করে বলেন,—"Wilkie's 'one world' does not inspire ridicule or contempt but simply raises serious thinking."

অনেকে হয়ত বলবেন যে, প্রকৃতি তার স্বকীয় ধারায় এই উচ্চ পর্যায়ে মানবকে মানুষকে রূপান্তরিত করবেন, তখনই এক উচ্চ পর্যায়ের সভ্যতা সৃষ্টি হবে। বিজ্ঞানের আর এক শাখা মনোবিজ্ঞান কিন্তু বলে যে, চেষ্টা ও চিন্তার দ্বারা মানুষ তার স্নায়ুর মধ্যে নূতন স্নায়ুকে জাগ্রত করতে পারে, বর্তমান স্নায়ুগুলির মধ্যে নূতন নূতন যোগাযোগ সৃষ্টি করে, এমনকি নূতন স্নায়ু সৃষ্টি ক'রে মানুষের মননশীলতাকে বৃদ্ধি করতে পারে। আর তার বীর্য যোনধর্ষণের কথা এ বিষয়ে না বলাই হয়ত ভাল কারণ, সে কথা শুনে আধুনিক সভ্যতা হয়ত বা হাসবে। হাসার দিন কিন্তু প্রায় শেষ হয়ে আসছে, কারণ আজকের physics ধীরে ধীরে metaphysics-এর রাজ্যের কাছাকাছি এসে পড়েছে। সুতরাং প্রকৃতির ওপর নির্ভরতা পরিহার ক'রে আমাদের সজ্ঞান ইচ্ছা ও চেষ্টায় আমরা আমাদের উন্নতি বিবর্তনের ধারার ওপর নির্ভর করতে পারি। প্রকৃতি দেবী কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিশ্বকল্যাণের পথে আমাদের বেশ কিছুটা এগিয়ে দিয়েছেন। পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ্‌গণ তাই মনে করেন- Arthur Nussbam বলেন— the atomic bomb....may prove "a part of that force which-ever *wills* the evil but ever *works* the good. Toynbee বলেন—"In the atomic age if we do not abolish war, war is going to abolish us." One world & India, Azad Memorial Lectures in New Delhi, 1950)

তার জোরের তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আজও ঘটেনি। প্রকৃতি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবতারণা ক'রে Covenant of the League of Nations সৃষ্টি করেছে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবতারণায় আরও উন্নতর Charter of the United Nations সৃষ্টি করেছে, যার preamble এর কিছু অংশের উদ্ধৃতির বিশেষ প্রয়োজন—

"We, the people of the Un ted Nations determined to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our life time has brought untold sorrow to mankind. and to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of human person, in the equal rights of men and women end of nations large and small,...and for these ends to practise tolerance and live together In peace with one another as good neighbours, ...to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples, have resolved to combine our efforts to accomplish these aims."

যেমন প্রকৃতিমাতা তার মানব শিশুর কল্যাণে কি অমৃতময় ছন্দময় প্রেমময় উচ্চারণ করেছে। তবুও আজ জাতিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এত দ্বন্দ্ব কেন? কারণ একটাই—আধ্যাত্মিক সভ্যতার অভাব। সেইজন্যই আন্তর্জাতিক আইনের সভ্যতাকে নিয়ে আজও রাষ্ট্রবিদ্, রাজনীতিবিদ্‌গণের মধ্যে বিরোধ। পাশ্চাত্য তার্কিক চিন্তা

তাই আশঙ্কা করছে—রাষ্ট্রের Sovreignty অক্ষুণ্ণ রেখে International Law কি ক'রে সম্ভব। এই কারণেই ঐ Charter আইনের অধিবেশন ভেদ ক'রে উঁকি দিচ্ছে Big Five-এর Veto power। এই আধ্যাত্মিক অনগ্রসরতার জন্যই সার্বভৌমিকতাবাদ জাতীয় প্রাচীর ভেদ ক'রে আন্তর্জাতিক সার্বভৌমিকতায় উত্তীর্ণ হয় নি এবং মানুষ যতদিন না সঙ্কীর্ণ রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা বর্জন ক'রে আন্তর্জাতিক সার্বভৌমিকতায় বিশ্বাসী হবে ততদিন বিশ্বপরিবার ভাবনা সার্থক হবে না।

আধ্যাত্মিক সভ্যতার বিকাশের অভাবেই মার্কসীয় ভাবনার কমিউনিজম্ রূপ ধারণ করে নি এবং এই কারণেই ঐ আদর্শে বিশ্বাসী দুই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের Sino-Russian দ্বন্দ্ব আমরা দেখতে পাই। আমরা ভুলে যাই সকল উন্নত সমাজ ও রাষ্ট্র চিন্তার ভিত্তি হচ্ছে মানবিকতাবোধ এবং এই মানবিকতাবোধের প্রাণ কেন্দ্র হচ্ছে প্রেম এবং এ প্রেম উৎসারিত হয় জীবনের আধ্যাত্মিক বিচার বিশ্লেষণে।

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ্ Toynbee তাই আধ্যাত্মিক সভ্যতার পৃষ্ঠপোষক। এ সভ্যতার লক্ষ্য শুধু goods-making নয়, man-making। প্রকৃতি অবশ্যই এই সভ্যতার দিকে দিকে অনেক গোলকধাঁধার পথে আমাদের নিয়ে চলেছে। চেষ্টা করলে এ গোলকধাঁধার পথ পরিহার ক'রে আমরা এ সভ্যতাকে ত্বরান্বিত করতে পারি।

ভারতীয় ভাবনার এই সভ্যতা নিছক কল্পনা বিলাস নয় এবং সময়ের পদচিহ্ন যারা অনুধাবন করতে পারে তাদের কাছে এই সভ্যতাই আগামী দিনের সভ্যতা, যে সভ্যতায় মানুষ দেহ থেকে বুদ্ধিতে, বুদ্ধি থেকে প্রেমে উত্তীর্ণ হবে।

মাতৃরূপা প্রকৃতি

শ্রীগোপাল দাস কাব্যভারতী

বর্ষে বর্ষে সাজে শস্য বর্ণালী আকাশ,
ছন্দে ছন্দে ফোটে ফুল নন্দিত বাতাস।
সৌরভ বহিয়া আনে প্রেমভক্তি জ্ঞান,
তাই শস্য বক্ষে মাতে আনন্দিত প্রাণ।
ভুবন মোহিনীরূপে প্রকৃতি জননী,
সাজিছেন নানা রূপে দিবস রজনী।
কখনো করালী কালী বটিকা প্রবাহ,
অশুভ নাশিনীরূপে সাজে মার্তাবহ।
কখনো বন্যার বেগে যত পাপ তাপ,
ধুয়ে মুছে নিয়ে যায় সকল সন্তাপ।
নূতন করিয়া সাজে ফুলে ও ফসলে,
নব রূপে ধরি ছোলে গ্রামের মেউলে।
শুযোগ সুযোগ আনে চিত্ত শোধনের,
ধরা বক্ষে প্রতিক্ষেত্রে জন-জীবনের।
ঐক্য মন্ত্র পড়ে শুরে বিভেদ ভুলিয়া,
এক সূত্রে বাঁধি যায় সব যে লুটিয়া।
জাতি বর্ণ ভুলে যায় সবই মানুষ,
শুধা রূপে আসে দেবী দিতে দেই হুঁস্।
তাই চণ্ডী মন্ত্রে শুধা রূপেন সংস্থিতা,
মাতৃস্তুতি বেদে ওঠে স্তবন সংহিতা।
দুর্গতি নাশিনী দুর্গা জীবের কল্যাণে,
দশমহাবিদ্যা রূপে দশবিধ জ্ঞানে,
প্রকৃতির নানারূপে তাহার বিকাশ,
অচিন্ত্য রূপিনী মাতা অনন্ত প্রকাশ।
সর্বভূতে নারায়ণী এই মহামন্ত্র,
উচ্চ কণ্ঠে গাহ জীব সাধনের তন্ত্র।
তং হি মাতা তং হি দুর্গা দুর্গতি নাশিনী,
"সারদা রূপিণী" মাগো কল্যাণ কারিণী।
অবোধ গোপালে ভনে আজ অনুভূতি,
আশ্রয় হউক তব দুর্গতি।

—:*:—

অলৌকিক নিরাময় রহস্য

শ্রীরাখালকৃষ্ণ আচার্য

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত মানুষকে রোগের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। রোগ নিরাময় করার প্রচেষ্টা থেকে জন্ম হয়েছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের। মানব সভ্যতার ও বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রোগ প্রতিরোধ ও নির্মূল করার নানা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এইসব পদ্ধতি আধুনিক বিজ্ঞানের ধ্যান ধারণা ও নিয়ম শৃঙ্খলার উপর স্থাপিত। তাই এইগুলিকে আমরা বিজ্ঞানযোগ্য বলে মনে করি।

অনেক সময় অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি প্রচলিত পদ্ধতিতে নিরাময় না হলেও অ-সাধারণ বা দৃশ্যতঃ অলৌকিক উপায়ে আরোগ্য হতে দেখা যায়। কিন্তু কি করে তা হয়, এর সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রচলিত চিকিৎসা বিজ্ঞানে পাওয়া যায় না। বাইবেল থেকে যীশু খৃষ্টের অলৌকিক রোগ নিরাময়ের কথা জানা যায়। অন্ধ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, কুষ্ঠরোগাক্রান্ত প্রভৃতি নানা দুরারোগ্য ব্যাধি তিনি অসাধারণ উপায়ে আরোগ্য করতেন। আমাদের দেশে প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত এই ধরণের আরোগ্যের সংখ্যাতীত বিশ্বাসযোগ্য নজির আছে। আমাদের দেশের উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন সাধক, মহাপুরুষ বা যোগীদের সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা অলৌকিক পদ্ধতিতে যে সত্য সত্যই ব্যাধি নিরাময় হয় তার প্রমাণ পেয়েছেন। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের গলরোগের ভীষণ কঠিন নিরাময়ের কাহিনী সর্বজন বিদিত। এইরকম আরও অনেক অলৌকিক নিরাময় কাহিনী উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রশ্ন এই যে, কি উপায়ে দুরারোগ্য ব্যাধিসমূহ মহাপুরুষদের কৃপায় নিরাময় হয় এবং এর মূল ভিত্তি কি?

লৌকিক চিকিৎসা পদ্ধতির বহির্ভূত উপায়ে আরোগ্যকে অনেকে সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখে থাকেন, কিন্তু পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণে এইসব নিরাময় যে সত্যই সংঘটিত হয় তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এইসব দৃশ্যতঃ অলৌকিক রোগ নিরাময়ের পেছনে নিশ্চয়ই কোন নিয়মকানুন আছে যা সাধারণের অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত। এইসব অ-সাধারণ তত্ত্বের উপর আলোকপাতের প্রচেষ্টা যাঁরা করেছেন তাঁদের মধ্যে স্বামীজি (স্বামী বিবেকানন্দ) এবং স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

তাঁদের মতে এইসব দৃশ্যতঃ অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের মূলে রয়েছে প্রাণশক্তি বা প্রাণ। এই শক্তি কোন বহিরাগত শক্তি নয়। প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিত্বে এই শক্তি নিহিত আছে। এই প্রাণ-শক্তিকে যথাযোগ্য সাধনা দ্বারা আয়ত্ত করা যায়। পাতঞ্জলের যোগদর্শনে প্রাণকে জয় করার সুনির্দিষ্ট পন্থার বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাণজয়ী বা যোগসিদ্ধ সাধক মহাপুরুষগণ শুধু রোগ আরোগ্যই নয়, আরও অনেক অবিশ্বাস্য অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী হন। পৃথিবীর কোন্ শক্তি তাঁদের উপর প্রভুত্ব করতে পারে না। তিনি আংশিকভাবে সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ হন—বলেছেন স্বামীজী।

প্রাণজয়ী যোগী মহাপুরুষগণের রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা প্রাণ-শক্তি প্রয়োগেরই নিদর্শন। প্রাণ-শক্তি এক দেহ হতে অন্য দেহে সঞ্চারিত করে দেওয়া যায়। প্রাণের অসামঞ্জস্য থেকেই রোগের উৎপত্তি এবং সঠিক-ভাবে প্রাণ-শক্তির প্রয়োগে রোগের নিবৃত্তি ঘটে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রাণ-শক্তি প্রয়োগের ধারার মধ্যে অনেক বৈচিত্র্য আছে। সাধুসন্ত যোগীদের কথা বাদ দিলেও কিছু কিছু সাধারণ লোকের মধ্যেও রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা দেখা যায়, যদিও তাঁরা জানেন না যে, মূলতঃ তাঁরা প্রাণ-শক্তিরই ব্যবহার করছেন। পাশ্চাত্যদেশে ও আমেরিকায় এইসব পদ্ধতি চুম্বকীয় নিরাময় (ম্যাগ্‌নেটিক্ হিলিং), মনের শক্তিতে নিরাময় (মেন্টাল হিলিং) আধ্যাত্মিক উপায়ে নিরাময় (স্পিরিচুয়াল হিলিং) প্রভৃতি নামে পরিচিত। এইসব পদ্ধতিগুলির মূলে রয়েছে প্রাণ-শক্তির ক্রিয়া। যাঁর ভিতর প্রাণ-শক্তির প্রাচুর্য আছে বা যাঁরা প্রাণময়ী তাঁরা প্রাণের নিরাময় শক্তিকে ব্যাধিগ্রস্তের দিকে পরিচালিত ক'রে রোগ নিরাময় করতে পারেন।

প্রাণ-শক্তিকে কি উপায়ে আয়ত্ত ও সংহত ক'রে প্রাণময়ী হওয়া যায় তার বিস্তৃত পদ্ধতি পৃথিবীর অন্য কোন বিজ্ঞানে পাওয়া যাবে না। কেবলমাত্র প্রাচীন ভারতের পতঞ্জলির যোগ সূত্রই এর একমাত্র পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান, যাকে স্বামীজী বলেছেন—"ইহা একটি মহাবিজ্ঞান। চতুরসহস্রাধিক বর্ষ পূর্বে ইহা আবিষ্কৃত হয়, সেইসময় হইতে ভারতবর্ষে ইহা প্রণালীবদ্ধ হইয়া বর্ণিত ও প্রচারিত হইতেছে।"

যোগসূত্রে বর্ণিত অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনার প্রতিটি স্তরে সিদ্ধিলাভ করতে পারলে শুধু রোগ নিরাময়ই নয়, আরও অনেক অত্যাশ্চর্য ও অবিশ্বাস্য ক্ষমতা বা বিভূতি সাধকের করায়ত্ত হয়। কিন্তু যাঁরা ঐ সব অলৌকিক বিভূতি দেখিয়ে লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করেন তাঁরা পথ ভ্রষ্ট হয়ে যোগের চরম লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেন না।

উপসংহারে বলা যায় যে, প্রাণ-শক্তি আয়ত্ত করাই যোগ সাধনার শেষ কথা বা চরম উদ্দেশ্য নয়। প্রাণের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে আরও গভীরে প্রবেশ করলে সন্ধান পাওয়া যাবে প্রাণের আধ্যাত্মিক রূপ বা কুল-কুণ্ডলিনী শক্তির, যা মানব জীবন ও অস্তিত্বকে মর্তের পঙ্কিলতা থেকে জ্যোতির্ময় দিব্যলোকে উন্নীত করতে সক্ষম। কুণ্ডলিনী জাগ্রত হলে মানুষ পশুত্বের স্তর থেকে ব্যক্তিসত্তার বিবর্তনের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছাতে পারে এবং সেটাই মানবজীবনের পরম পুরুষার্থ।

—:০:—

তুই যে আমার প্রিয়

শ্রীজ্যোৎস্না নাথ মল্লিক

কোন কাজে তব লাগিনা ত' আমি,
চাহি মুখপানে হে অন্তর্যামী,
করুণার আঁখি সুধা পান করি,
পরম কৃপায়, প্রণামটি মোর নিও।
ঠাকুর বলেন, 'তুই যে আমার প্রিয়'।

অকর্ম দীন বসে বসে লাজ পাই,
কম্প্রহৃদয়ে মুখপানে তব চাই,
অভয় হাসিয়ে সকল ভীরুতা হরি,
পরম কৃপায় প্রণামটি মোর নিও।
ঠাকুর বলেন, 'তুই যে আমার প্রিয়'।

ভাসায়ে আঁধার আলো ঝলমল,
ভালো রূপ রস গন্ধে পাগল,
সত্ত অরূপ মমতা পরশ,
পরম কৃপায় প্রণামটি মোর নিও।
ঠাকুর বলেন, 'তুই যে আমার প্রিয়'।

হেতুহীন কৃপা মায়ের নজর,
তুচ্ছ তৃণও পায় সমাদর,
কণাসুন্দর দয়াল হে প্রভু,
পরম কৃপায় প্রণামটি মোর নিও।
ঠাকুর বলেন, 'তুই যে আমার প্রিয়'।

মহাধর্মাধিকারীর আত্মাহুতি

দীপেন রাহা

সুপুরুষ, প্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ মহামন্ত্রী হলায়ুধ মিশ্র প্রজাদের কাছে দেবতুল্য পুরুষ। তিনি স্বীয় গুণে রাজ্যের মহাধর্মাধিকারীর পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর রূপ ও গুণের খ্যাতি রাজ্যময় ছড়িয়ে পড়ে। সকলেই তাঁর রূপে গুণে মুগ্ধ।

একদিন রাত্রে এক তরুণী হলায়ুধের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে। হলায়ুধ স্বীয় সহধর্মিণী মনে ক'রে তাকে আদর আপ্যায়ণ করেন। কিন্তু ভাবাবেগ স্বাভাবিক হয়ে আসতেই তিনি নিজের ভ্রম বুঝতে পারেন। অনুশোচনায় হলায়ুধ মিশ্র জ্বলে পুড়ে যেতে লাগলেন। তিনি ঈশ্বরের কাছে, রাজার কাছে প্রতিশ্রুত নারীর সম্মান রক্ষার জন্য, অসহায়কে রক্ষার জন্য, দুষ্কৃতদের শাস্তিদানের জন্য। আজ তিনি স্বয়ং ব্যাভিচারিতার অপরাধে অপরাধী। জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক অপরাধী অপরাধীই এবং নিয়ম মাফিক তার শাস্তি অবশ্য প্রাপ্য। তিনি যত বড় রাজকর্মচারীই হোন না কেন। পাপের শাস্তি নিজেই হবে। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাকে করতেই হবে। বাকী রাত্রি হলায়ুধ মিশ্র অস্থিরতার মধ্যে কাটালেন। দুশ্চিন্তার অবধি নেই।

পরদিন রাজসভায় এ মুখ কী ক'রে দেখাবেন। অন্তরঙ্গ কলঙ্কের কথা তার পক্ষে গোপন রাখা বিবেক বিরুদ্ধ কাজ। নিজে রাজ্যের মহাধর্মাধিকারী হয়ে চরম অধর্মের কাজ করেছেন। রক্ষক হয়ে ভক্ষকের কাজ করেছেন। এ অপরাধের সীমা নেই, প্রায়শ্চিত্ত নেই। এর চাইতে বড় অবশ্য অপমান আর কী হতে পারে। কিন্তু গোপন করা মানে কাপুরুষতা। তা' কিছুতেই করা চলে না।

পরদিন রাজসভায় রাজা বল্লালসেন ও অন্যান্য অমাত্যগণ মহাধর্মাধিকারীর অস্বাভাবিক চেহারার পরিবর্তন দেখে আঁতকে ওঠেন। এক রাত্রের মধ্যেই যেন তাঁর বয়স অনেক বেড়ে গেছে। অনিন্দ্য সুন্দর চেহারা চুপসে গেছে। সকলেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন হলায়ুধ মিশ্রের মুখের দিকে।

হলায়ুধ মিশ্র অপরাধীর কণ্ঠে বিগত রাত্রের কাহিনী বর্ণনা ক'রে অপরাধ স্বীকার করলেন। বললেন— রাজ্যের জন্য যে কোন প্রতিষ্ঠিত বা সামান্য ব্যক্তি এ ধরণের অপরাধ করলে চরম শাস্তি দিতাম। আমি নিজে মহাধর্মাধিকারী হয়ে ব্যাভিচারের অপরাধে অপরাধী। কাজেই চরম শাস্তি আমার পাপ্য। এরজন্য শাস্তি গ্রহণ না করলে আমি ঈশ্বরের কাছে, মহারাজার কাছে ও প্রিয় প্রজাদের কাছে চিরঅপরাধী থেকে যাবো। তাই আমার শাস্তির বিধান আমিই করছি বলেই তিনি স্বীয় শাস্তি ঘোষণা করলেন।

বিরাট হুতাশন প্রস্তুত হোক। এই হুতাশনে আমি আত্মাহুতি দেবো। মহাধর্মাধিকারীর আদেশে হুতাশন তৈরী হল। সেই প্রচণ্ড হুতাশনের মধ্যে রাজ্যের মহামন্ত্রী, মহাধর্মাধিকারী হলায়ুধ মিশ্র প্রশান্ত মুখে উপবেশন করলেন। ধীরে ধীরে তাঁর সুন্দর সুঠাম দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ন্যায়াধীশ হলায়ুধ এক অভূতপূর্ব আত্মবিচারের নিদর্শন রেখে গেলেন। রাজ্যের রাজা, আমাত্য ও প্রজাবর্গগণের শ্রদ্ধা ও ভক্তি ন্যায়পরায়ণ মহাধর্মাধিকারীর প্রতি শতগুণে বেড়ে গেল।

বাঙ্গালীর দুই "অমৃত" পরিবেশক

শ্রীসতীশচন্দ্র নাথ

চৈত্রের কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের জয়ন্তী উদ্‌যাপন করা হয়। তারই এক মাস পরে আষাঢ়ের কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথি। পূর্বকার পঞ্চমী তিথি অপূর্ব গ্রন্থ-জয়ন্তী আর পরবর্তী পঞ্চমী তিথি অবিস্মরণীয় গ্রন্থকারের জন্ম-জয়ন্তী। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত গ্রন্থকারের জন্মজয়ন্তী। এই তিথিটিকে বলা হয় নাম-পঞ্চমী। নবযুগে নবভাবে এই তিথিকে মহেন্দ্র পঞ্চমী তিথি বলেই বিশেষভাবে স্মরণ করা যায়। এই স্মরণীয় তিথিটিতেই শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ধরণীতে আবির্ভূত। গুপ্ত পদবীধারী এই মহান ব্যক্তি যথার্থই গুপ্ত থেকে জগতের জন্য যা সঞ্চয় ক'রে রেখেছিলেন, তা অনুপম।

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব হুগলী জেলার পল্লীগ্রামে। সে গ্রামটি ছিল অজ্ঞাত, পথঘাট অবহেলিত। সেখান থেকে এলেন মহানগরের উত্তর প্রান্তের ভাগীরথী তীরে দক্ষিণেশ্বরে। এখানেই তাঁর সাধনা, সিদ্ধি আর জগৎ কল্যাণের বাণী প্রচারের জন্য ভক্তদের আকুল আহ্বান—"ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়, আমি যে একলা থাকতে পারছি না"। এ ডাকে সাড়া দিয়েছিল, কাছের আর দূরের যুবক আর দু'চার জন চিহ্নিত ব্যক্তিও। দক্ষিণেশ্বরের সে ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন পূর্ববঙ্গের শ্রীদুর্গাচরণ নাগ মহাশয়। আরও বিস্ময়ের বিষয়, শ্রীরামকৃষ্ণের ডাক পৌঁছে গিয়েছিল হাওড়া জেলার অজ্ঞাত পরিচয়ের যুবক রামতারকের (পাটু) কানে। সুদূর নেপালে, সিন্ধুদেশেও সে ডাকে সাড়া দেবার যোগ্য আধার ছিল। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ২৬শে ফেব্রুয়ারী ২৮ বৎসরের এক ইংরেজী শিক্ষিত বিশিষ্ট বাঙ্গালী যুবক (Young Bengal) এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে। প্রথম মিলনেই শ্রীরামকৃষ্ণ চিনতে পেরেছিলেন—এ তাঁরই লীলার একান্ত সহচর। এ যুবকের নাম শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, যিনি কলকাতা ঠনঠনিয়ার গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে বাস। অল্পক্ষণ আলাপের পর "আবার এস" বলে শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ বিশিষ্ট যুবককে ঐ দিন বিদায় দিয়েছিলেন, কিন্তু যুবক যেন আকর্ষিং-এর মোহার আকৃষ্ট হলেন। বারবার মন্ত্রমুগ্ধ আকর্ষণে যেতে হয়ে ছিল দক্ষিণেশ্বর বা কলকাতারই বিভিন্ন স্থানে। এ যাতায়াত পাঁচ বৎসরের মধ্যে কয়েকটী দিন মাত্র। মহাকালের বিচারে ক্ষুদ্র অংশ কিন্তু জগৎ কল্যাণের জন্য অনন্তকালের সঞ্চয়ন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সান্নিধ্যই পরবর্তীকালে স্ফুরিত হয় "কথামৃত" আকারে। লিখনের প্রারম্ভে আমরা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থকে স্মরণ করেছিলাম কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন—"সাধু চোখে গৌরাঙ্গের সাঙ্গোপাঙ্গ সব দেখতে পেয়েছিলাম, তার মধ্যে তোমায়ও যেন দেখতে পেয়েছিলাম"। আমরা সাধারণ মানুষ আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির অতীত ব্যাপারে কিছু বলবার অধিকার নেই। যাঁর লীলা তিনিই তাঁর লীলা সহচর এক এক জনকে বিশেষভাবে নিয়োজিত করেছেন। ভগবান কাকে দিয়ে কোন্ বিশেষ কর্মটী কিভাবে করানো হবে তা আগে থেকেই ব্যবস্থা ক'রে রাখেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের বহু পূর্ব থেকেই, স্কুলে পড়ার কালে শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তের ডায়েরী লেখার সহজাত অভ্যাস। সে অভ্যাস বশেই শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত মিলন বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করতেন। এ রোজ নামচা লিখনেও তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল সন তারিখ, সমুপস্থিত ব্যক্তিবর্গ, আর কোন প্রসঙ্গের কি কথা সব সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা। তিনি যেন গোপন Tape recorder. অপরাপর যে সকল যুবক শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে যাতায়াত করতেন তাঁদের কাউকে কিছু লিপিবদ্ধ করতে তিনি উৎসাহ দেন নি, পরন্তু মাষ্টারের লিখনের অভ্যাস জেনে নিরুৎসাহ করেন নি।

জগতের ইতিহাসে এমন অহংরহিত লেখা আর লেখক খুঁজে পাওয়া যায় না। তাইতো পাঁচখণ্ড শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত গ্রন্থে তিনি 'মাস্টার' 'মণি', মণিমোহন' 'জনৈক ভক্ত', 'শ্রীম', 'M' ইত্যাদি পরিচয়ে নিজেকে গোপন রেখেছেন। যাঁরা মাস্টারমশায়ের দর্শন পেয়েছেন তাঁদের কাছে তিনি বলেছেন—"ডায়েরীতে প্রথম প্রথম অনেক কিছু লেখার অভ্যাস ছিল কিন্তু ঠাকুরের দর্শনের পরে তাঁর প্রসঙ্গই সূত্রাকারে লেখা হত। কী আশ্চর্য, তাঁর শরীর ত্যাগের পর সে সব অমৃত কথা আর পুণ্যকাহিনী স্মৃতিপটে অম্লানভাবে অঙ্কিত ছিল। ত্রিশ চল্লিশ বছর পরেও ডায়েরীগুলি খুলে একটু ধ্যান চিন্তা করলেই সেই পুরাণো দিনের শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সব কথা স্ফুরিত হত।"

"কথামৃত" গ্রন্থকার কর্তৃক কষ্টোদ্ভাবী। শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র ক'রে কতো তোলা। শ্রীম যে চিত্র তুলেছেন তাতে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, নরেন্দ্রনাথ যেমন উজ্জ্বল হয়েছে, তেমনি বিদ্যে যি, বাড়ুয্যের রসিকও বাদ পড়েনি। দক্ষিণেশ্বরে ভবতারণীর অলঙ্কার শ্রীপদের নূপুর যেমন ফুটে উঠেছে হাঁসপুকুরের পাতিহাঁস, পরমহংস রামকৃষ্ণের সঙ্গে চিত্রে স্থান পেয়েছে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে দুই অনুপম গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। চরিতামৃতে জীবনাখ্যান অপেক্ষা দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনাই অধিক। সে সময়কার সাহিত্য রীতিকে শ্রদ্ধা ক'রেও কবিরাজ গোস্বামী তাঁর লিখিত গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় না লিখে বাংলা ভাষাতেই পয়ার ছন্দে গভীর তত্ত্বের আলোচনা আর বিশ্লেষণ করেছেন, অবশ্য তাঁর রচিত গোবিন্দ লীলামৃতম্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতের টীকা এখনও বৈষ্ণব সংস্কৃত সাহিত্যে স্থান পেয়ে আছে।

কথামৃতের প্রবক্তা শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষা এবং ভাবনাকে দেবভাষার উর্দ্ধে স্থান দিয়েছেন বাংলার চলতি ভাষা এমনকি হুগলী আরামবাগের উচ্চারণ যেমনটী শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে উচ্চারিত হয়েছিল তেমনটী তাঁর মহাগ্রন্থে স্থান পেয়ে বাংলা ভাষা আর গ্রন্থের মর্যাদা বাড়িয়েছে।

"চরিতামৃতের" উপাদান প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে এবং বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচন্দ্রোদয় গ্রন্থ, মুরারি গুপ্তের কড়চা। শ্রীরূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী প্রভৃতি শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদদের উক্তিই ছিল কবিরাজ গোস্বামীর প্রধান অবলম্বন। মহাপ্রভুর জন্ম ১৪৮৬ খৃঃ আর কবিরাজ গোস্বামীর জন্ম ১৫১৭ খৃঃ। তিনি প্রত্যক্ষদর্শী নন।

"কথামৃতে" শ্রীম যা মাস্টারমশায় রূপে যা শুনেছেন, স্বচক্ষে যা দর্শন করেছেন, স্বীয় স্মৃতি ক্যামেরায় যা ধারণ করেছেন, তাই পরবর্তীকালে তিনি জগতের জন্য প্রকাশ করেছেন এবং প্রচার করেছেন। এই বিচারে তিনি কথামৃতের প্রবক্তা, গ্রন্থকার নন, এই কারণে কথামৃত শ্রীম কথিত, লিখিত নহে।

চৈতন্য ভিরোভাব অব্দে ইং ১৫৭২ সনে আরম্ভ করে ১৫৮২ সন পর্যন্ত রচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সংস্কৃত শ্লোকের অনেক উদ্ধৃতি আছে। পরন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সুরু করে প্রকাশিত কথামৃতে উপনিষদ, ভাগবত, গীতার শ্লোক উদ্ধৃতি তো আছেই, তার উপরে বাইবেলের আলোকও স্থান পেয়েছে। এর কারণ শ্রীম যে বর্তমানকালের বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র এবং সুযোগ্য শিক্ষক অধ্যাপক ছিলেন, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ অধিকার ছিল। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাঁর কাছ থেকে বাইবেল অনুসরণে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনবেদের বাণী শোনবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। আমরা দেখেছি সেন্টজেভিয়ার কলেজের Rev Kelly (কেলি-সাহেব) ১৯২৪ সনে শ্রদ্ধা বিনম্র চিত্তে শ্রীম-এর সঙ্গে বাইবেল আলোচনা করতেন, ভবানীপুরস্থ গদাধর আশ্রমে।

লোকালয়ের গণ্ডীর মধ্যে এমন ভাগবত জীবন যাপন, একালে দুর্লভ। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর জন্মস্থান বাঢ়বঙ্গের বর্ধমান জেলার ঝামটপুরে। বর্তমান ইস্টার্ন রেলের কাটোয়া ষ্টেশনের পূর্বদিকে দু'মাইল দূরে। কবিরাজ গোস্বামী পরবর্তীকালে গৌরধাম থেকে ব্রজধামে গিয়েছিলেন। সেখানে রাধাকুণ্ডের তীরে শ্রীমদন গোপালের আদেশে বৈষ্ণবদের কৃপা স্মরণে মহাগ্রন্থ লিখেন। তখন তিনি আশী বৎসরের বৃদ্ধ। চক্ষুতে ভাল দেখেন না। কানে ভাল শুনেন না।

আর মাষ্টারমশায়ের জন্ম মহানগরীর বুকে। লিখন স্ফুরিত হয় পরিণত বয়সে। তখন তিনি কলেজের অধ্যাপক। স্বাতী নক্ষত্রের বারিবিন্দু গ্রহণ ক'রে শুক্তি যেমন তাকে মুক্তায় পরিণত করে শ্রীম এর পক্ষেও তাই। শ্রীরামকৃষ্ণের কথার যে বিন্দু তিনি যখনই যেখানে পেয়েছেন তা সযত্নে রক্ষা করেছিলেন সংগোপনে। ভাগীরথী তীরে দক্ষিণেশ্বরে যা পেয়েছিলেন তা নির্জনে প্রকাশনের জন্য কবিরাজ গোস্বামীর মতো "রাধাকুণ্ডের তীরে" যেতে হয়নি। বরং তার বিপরীত ধারার মধ্যেও লেখা বিঘ্নিত হয়নি।

মহাপ্রভু নীলাচলে লীলা করেছিলেন। সেই নীলাচল শ্রীক্ষেত্রের তীর্থযাত্রী দর্শন, আর তাঁদের কাছ থেকে একটুখানি মহাপ্রসাদ পাবার জন্য তিনি নয় সপ্তে হাওড়া ষ্টেশনে যেতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহান্তের এগারো বৎসর পরে মাষ্টারমশায়, Gospel of Sri Ramkrishna নামে ইংরেজী গ্রন্থ লিখেছিলেন। তারপর ১৩০২ সনে যে ভাষায় শ্রীগৌরাঙ্গ আর শ্রীরামকৃষ্ণ কথা বলেছিলেন, যে ভাষায় "চরিতামৃত" রচিত হয়েছিল, সে ভাষায় "কথামৃত" স্ফুরিত হল। চরিতামৃত আর কথামৃত, বাংলার দুই অমৃত পরিবেশককে শতসহস্র প্রণাম নিবেদন করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ বন্দনা

শ্রীসৌরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বভুবন নন্দিত করি এসেছো পরমানন্দ।
তব সুমহান সৃষ্টি হে প্রভু অভেদ-বিবেকানন্দ।
বিবেক অভেদানন্দ।
তমসার যুগে অপরূপ জ্যোতি
গোপালদা গৌরী সাধনা সরস্বতী
রঙ্গমঞ্চের যত নট-নটী দেখোনি কারেও মন্দ।
ওগো মহারাজ তব নাম গানে লভিল দিব্যানন্দ।
ব্রহ্মানন্দ প্রেমিক পুরুষ
ধরণী সে বাবুরাম
সারদানন্দ যারী শ্রীশ্রীমা'র
শশী-লাটুর গুরু প্রাণ।
বিশ্বাসে ভরা গিরীশের মন
দুর্গা নাম করে সেবা অনুক্ষণ
শ্রীম লিখে নিলো অমিয় বচন অক্ষয় দিল ছন্দ।
এক দেহে রাম-কৃষ্ণ এসেছে আঁখি মেলে দেখ অন্ধ।
মহাতেজস্বী নিত্য নিরঞ্জন
বুড়ো গোপালদা বৈরাগী
ত্রিগুণাতীত সে বার্তাবাহক
হরিপ্রসন্ন ত্যাগী।
সুরেন্দ্র রাম ভকত প্রধান
শুদ্ধ অন্ন যেন বলরাম
মহীয়সী মাতা রাণী রাসমণি জ্ঞানী সে নির্মলানন্দ।
প্রণমি আজিকে সবার চরণে যতেক ভকতবৃন্দ।
অখণ্ডানন্দের দেবাধর্ম সার
যোগেন সেবক সারদা মাতার
দেহবোধহীন হরি মহারাজ আত্মারাম শিবানন্দ।
দীনদাস বলে রামকৃষ্ণ নাম ঘুচাবে সকল দ্বন্দ্ব।

স্বরূপ সন্ধ্যানন্দ

তুমি ডাক দিয়েছ

যোগদাপুরী

সেদিনের সেই পুরানো সুরভিত আলোকের কয়েকটী দিন। শ্রীঠাকুরের শাখা আশ্রমগুলির মধ্যে যখনই শুভ আগমনের কথা হত, বাঙ্কিকার, রাসমন থেকেই ডাক আসতো শ্রীঠাকুরের গাড়ী আনবার জন্যে। সেইজন্য বাঙ্কিকার আশ্রম থেকে সুধানন্দ মহারাজ ঠাকুরের জন্য স্বতন্ত্রভাবে রাখা করাতেন ভাল গাড়ী আর বলিষ্ঠ দুটী হাতীর মত সুন্দর বলদ।

সেবার ঠাকুর যাবেন আমজোড়া আশ্রম—রাত্রি এগারটা থেকে যে কোন সময়ের মধ্যে। সারাদিন ভক্তদের আনন্দ আর তার সঙ্গে ঠাকুরের জন্যে একটী গাড়ী ভালোভাবে সাজানো হয়েছে যদিও ঠাকুরের ইচ্ছা থাকে বাঙ্কিকার থেকে ঠাকুরের জন্যে দুটী গাড়ী তবুও সেবার ঠাকুর কিছু জানালেন না প্রকাশ্যে।

সেদিন সন্ধ্যারতি সবে আরম্ভ হয়েছে বাঙ্কিকার আশ্রমে। এমন সময় সুধানন্দ মহারাজ (পিতৃদেব) শুনলেন—সুবন খুব তাড়াতাড়ী দুটি গাড়ী নিয়ে এস। কি ব্যাপার কিছু না বুঝে কোন দিকে না চেয়ে সুধানন্দ মহারাজ দুটি বাহককে ডেকে পাঠালেন আর বললেন, মতিলাল আর জসম তোরা দুটী গাড়ী এক্ষুনি সুন্দর ক'রে সাজিয়ে নিয়ে আয়, আমি সিউড়ী যাব। যথা আজ্ঞা তথা প্রস্তুত। তাড়াতাড়ি দুটি গাড়ী নিয়ে এসে সুধানন্দ মহারাজ সিউড়ী এলেন।

রাত্রি তখন এগারটা। ভোগ নেওয়ার পর ঠাকুর উপরের ঘরটীতে বসে আছেন যেন কিসের অপেক্ষায়—সুধানন্দ মহারাজকে প্রণাম করতে দেখেই বললেন, এত দেরী করলে যে, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রে বসে আছি। সুধানন্দ মহারাজ খুব বিস্মিত হয়ে বললেন, সেকি ঠাকুর আমি কোন চিঠিও পাই নি কোন খবর না, শুধু মিষ্টি একটী কণ্ঠ শুনলাম—সুবন এক্ষুনি দুটী গাড়ী নিয়ে এস, তাই নিয়ে এসে হাজির। ঠাকুর বললেন, হাঁ। আমার আমজোড়া আশ্রম যাবার কথা আছে এই রাত্রেই। তুমি গরু দুটীকে একটু খাইয়ে বিশ্রাম করতে দিতে বল। আমি একটা-দুটোর মধ্যেই রওনা হব। আমাকে ঠিক নদীর তীরে ভোরের লাল সূর্য্যটী দেখিয়ে দিতে পারবে? সুধানন্দ মহারাজ বললেন, আপনার কৃপা হলে সবই সম্ভব হবে। যথা রাত্রির মধ্যে দুটী গাড়ী ছুটে চলেছে।

একটীতে (শ্রীঠাকুরের পিতামাতা) কর্ত্তা ঠাকুমা আর একটী গাড়ীতে স্বয়ং ভগবান ঠাকুর সন্ধ্যানন্দদেব। রায়বন জোনাকি আলোর রাতের পথে ছুটে চলেছে গাড়ী। কিছুক্ষণ মধ্যে ভোরের আকাশ আলোয় হেসে উঠেছে। পাখীদের কলগান আর ওদিকে আমজোড়া আশ্রমের নিকট নদীর তীরে লাল সূর্য্য হেসে উঠেছে সবুজ বনান্তের বুকে। ঠাকুর গাড়ীর পিছন দিকে চেয়ে দেখলেন রাগরঞ্জিত সূর্য্যের রূপ। জবাকুসুমের রাঙ্গা ভোরখানি দেখে ঠাকুর আনন্দিত হলেন—সুধানন্দ মহারাজকে করলেন আশীর্ব্বাদ। সেদিন ঠাকুরকে নিয়ে ভক্তদের আমজোড়া আশ্রমে সারাদিন কেটে গেল মহানন্দে।

এমনি আর একদিন কুসুম কোটা বেলায়, সুধানন্দ মহারাজ বাঙ্কিকারে ফুটবল খেলার মাঠে খেলার পর ছেলেদের নিয়ে ফিরছেন বিকেলবেলায়, এমনসময় সামনে দাঁড়িয়ে জসম। সুধানন্দ মহারাজ হঠাৎ জসমকে দেখে বললেন, আচ্ছা চলতো জসম আজ একবার বোলপুর শান্তিনিকেতন ঘুরে আসি। তুই ঠাকুরের গাড়ী আর গরু দুটী সাজিয়ে নিয়ে আয়।

সুধানন্দ মহারাজ সুন্দর ক'রে গাড়ী, গরু সাজিয়ে নিয়ে এসে বোলপুরের ষ্টেশনের ধারে দাঁড় করিয়ে একটু গাড়ীতেই বিশ্রাম করছেন। রাত্রি তখন প্রায় অনেকটা। এমন সময় একটা হৈ চৈ শব্দ আর একটী সুন্দর সাজানো গাড়ী আর কয়েকটি গরুর গাড়ী এগিয়ে আসছে। গরু দুটী গাড়ীর আওয়াজ শুনে চমকে ওঠে আর সুধানন্দ মহারাজেরও ঘুম ভেঙে যায়। এমন সময় দেখেন মানিকজ্যাঠার ভাই আনন্দকা আর নারায়ণ বাবু সেইদিকে আসছেন সাইকেলে চেপে। কি ব্যাপার সব শুনলেন। ঠাকুর আসছেন বোলপুর ষ্টেশনে, রায়পুর যাবেন। সহসা সুধানন্দ মহারাজকে দেখে আর সুন্দর গরুর গাড়ী দেখে বললেন, ও বাবা ঠাকুরের গাড়ী গরু সব এসে গেছে। তবে আর কি এই গাড়ীতে কি আর ঠাকুর চাপবেন। সুধানন্দ মহারাজকে পিঠ চাপড়ে বললেন, তোমার গাড়ীতেই ঠাকুর চাপবেন। ভক্তভগবানের লীলা আমরা কি বুঝবো। এই কথা শুনে সুধানন্দ মহারাজ তো অবাক, ভগবান কৃপা ক'রে বার বার আহ্বান ক'রে ডেকে নিয়ে আসছেন তাঁরই প্রয়োজনে। এদিকে বোলপুর ষ্টেশনে ট্রেন এসে হাজির। অনেক ভক্তের মাঝে ট্রেন থেকেই ঠাকুর সুধানন্দ মহারাজকে দেখে প্রসন্ন হলেন, আর নেমে তাঁরই গাড়ীতে চাপলেন।

রায়পুরে ভক্ত ভগবানকে ঘিরে কেটে গেল মিষ্টি বেলা। ভক্তসেবা পর্ব্বের সুন্দর আয়োজনের মাঝে ঠাকুর, আনন্দকা আর নারায়ণ বাবুকে ডেকে বললেন, আমার আসরের গরু দুটীরও যেন যত্ন হয় দেখ। ঠাকুরের করুণা দেখে ভক্তরাও খুব আনন্দ করতে লাগলেন।

আর একদিন সাগর সঙ্গমের মত মেলা বসেছে ভক্তদের দুবরাজপুর আশ্রমের ভগবান সত্যানন্দ দেবকে ঘিরে। সেদিন মধ্যাহ্নবেলায় ভূপানন্দ মহারাজ, সন্তোষ এঁরা কিছুটা ভীড় কমে যাওয়ার পর গেটের দরজা দুপুরে বন্ধ ক'রে দেওয়া করালেন। আবার বৈকালে খোলার কথা বললেন। সেদিন যেন মেলা হয়ে গেছে। ভক্তদের প্রসাদ, আশীর্ব্বাদ দেওয়ার পর ঠাকুর স্নান সেরে ভোগ নিতে বসেছেন। এমন সময় শুনলেন দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ। প্রভাকর মহারাজ বল্লেন, এখন দরজা খোলা হবে না। গেট বন্ধ, আবার বৈকালে খুলবে। এখন ঐ দিকটায় অপেক্ষা কর। ঠাকুর ভেতর থেকে দরজায় ধাক্কা দেওয়ার আওয়াজ শুনে বললেন, ওরে দরজা খুলে দিতে বল, বাড়িকারের ভক্তরা এসেছে। ঠাকুরের আদেশ শুনে আরাধনাদি, সীতাদি তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলেন। এসে দেখেন সত্যি। বাড়িকারের আশ্রমের ও ভক্তবাড়ীর সকলে। শ্যামল, পতিতপাবন, দুর্গা, লক্ষ্মীদি বেলামা, অন্নপূর্ণা, সোভা বৌদি রুনু, অবা বীজু বড় বাড়ীরও দু'একজন এসে দাঁড়িয়ে আছে। ঠাকুর সকলকে ডেকে প্রসাদ দিলেন। ভক্তের আন্তরিক টানটী ভগবানের কাছে অতি প্রিয়। ভক্ত হয়ে যায় বশ ভগবান সত্যানন্দদেবের অপার মহিমা আর কৃপা দেখে—কমল রাঙ্গা চরণে লুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম জানায়। আর তাঁর বাণী স্মরণ হয়- 'যো যস্ত মিত্রম্ ন হি তস্ত দূরম্'।

—:০:—

"ধরণীর পরম লগ্নগুলি চুপিসারেই আসে—ধরণীর ক্ষণগুলির কথা ইতিহাসের পাতায় বড় একটা লেখা হয় না। মঙ্গলময়ী উষসীর মত ধীরে ধীরে ভরে দিয়ে যায় জীবনের পাত্র পূর্ণতায়।"

—শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দ

যুগাধিরাজ

[ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনবেদ অবলম্বনে গীতি-আলেখ্য]

শ্রীঅর্চনা দেবী

যুগে যুগে ধরণীর আর্ত অন্ধকারে একটি আলোই জ্বলেছে। যে আলোর পানে চেয়ে অন্ধকারে মুখ ঢেকে পড়ে থাকা মানুষ আবার পথ চলতে সুরু করেছে। কে জ্বেলেছে সেই আলো? যুগ পরিত্রাতা ভগবান। তিনিই বারবার এসেছেন নেমে, সেই পথ দেখানো আলোক বর্তিকা হাতে। যখনই ঘটেছে ধর্মের গ্লানি অধর্মের অভ্যুত্থান, মাটির মানুষ আকাশের পানে হাত তুলে ডেকেছে—কে আছ? অন্ধকারের হাত থেকে বাঁচাও আমাদের। তিনি এসেছেন আর্ত মানুষের মাঝখানে। আর্তের দল আকুল হয়ে গেয়ে উঠেছে—

তুমি আর্তের তরে এসেছ নামি
হে মোর ভগবান
হে মোর আশ্রিত ভগবান।
প্রেমের মূরতি দয়ার স্বরূপ করুণার অবদান।
হে মোর আশ্রিত ভগবান।
মৃতের হৃদয়ে অমৃত দানিলে
ধরারে ধোয়ালে শান্তি সলিলে
দিকে দিকে শুধ প্রেম করুণার দিলে অমরার দান।
হে মোর ভগবান
হে মোর আশ্রিত ভগবান।
দেব নর ঋষি মিলিয়াছে আসি
মর্তে বেজেছে অমর্তের বাঁশী
ধরণের হাসি দুলিয়া উঠেছে
এনেছে প্রেমের বান
হে মোর আশ্রিত ভগবান।

একবার নয়, দু'বার নয়—এ আবির্ভাব ঘটেছে বারবার অনেক বার। ভাঙা গড়া উত্থান পতনের মধ্য দিয়েই তো রচিত হয়েছে সৃষ্টির ইতিহাস। পুরাতনের ভগ্ন উপাদানের ভিত্তিতেই নূতন এসে দাঁড়িয়েছে চিরদিন। তা না হলে বৈচিত্র্য রক্ষা হয় না যে। বেদনার নিষ্ঠুর আঘাত না থাকলে করুণার স্পর্শ তো মধুর লাগে না। তাই যুগে যুগে ভগবান যখনই এসেছেন তার আগে বেদনার আগুনে আমাদের জ্বালিয়ে নিয়েছেন। তবেই তো তাঁর আবির্ভাবকে আমরা স্বাগত জানিয়ে বলেছি—

যুগে যুগে একি করুণা ভরে
এসেছ নামি ধূলার ঘরে।
নব অরুণের বারতা বাহি
এসেছো আলোর তরণী বাহি
এনেছো কমল ফোটার বাণী
আমার বন্ধ আঁধার ঘরে।
নয়ন জুড়ানো কাজল আঁকি
আগালে জাগিনি নয়ন ঢাকি
জানি গো জানি তবু যে জানি
তুমি যে আছ আমারি তরে।

কখনও অযোধ্যার রাম, কখনও বৃন্দাবনের কৃষ্ণচন্দ্র, কখনও নদীয়ার গৌরা রায়, প্রতিবারই তাঁকে আমরা দেখেছি—দেখেছি সেই অনাদি পুরাতনকে চিরনূতনের বরবেশে। এবার এলেন উনবিংশ শতাব্দীর সমস্ত প্রশ্নের মূর্ত সমাধান হ'য়ে। এ সেই যুগ, যে যুগে একদিকে পাশ্চাত্যের জড়বাদ আর অজ্ঞেয়বাদ, অপরদিকে প্রাচ্যের মুসলমান ধর্মের ভোগ মুখীনতা ও নানামতের দ্বন্দ্বময় পরিস্থিতি, সৃষ্টি করেছিল এক জটিলতম পরিস্থিতির। ফলে ভারতের জাতীয় সংস্কৃতির মূল রূপটি ভেঙে চুরে একাকার হয়ে গিয়েছিল। সেই যুগে এলেন ভগবান নর-রূপধারী নারায়ণ শ্রীরামকৃষ্ণরূপে। যুগ সঙ্কটের সমস্ত সঙ্কট মোচন করতে।

তুঁহু রাম তুঁহু কৃষ্ণ
অব রামকৃষ্ণ নাম
তুঁহু দেব আদি দেব
তুঁহু মেরো প্রাণ।
তুঁহু পিতা তুঁহু মাতা তুঁহু পরমধাম
তুঁহু মেরো হৃদয় নাথ তুঁহু মেরো কাম।
তুঁহু মেরো দুখ হারী
তুঁহু মেরো আঁখ বারী
পুকারি তেরো নাম হরি
অব অব তেরো নাম।

কোথায় এলেন যুগ দেবতা? বিশ্বের দিগন্ত দৃষ্টিতে বিস্ময় মুখরতা। তিনি এলেন দীনের কুটীরে দীনের ঠাকুর হ'য়ে। বাংলার এক অখ্যাত পল্লী,—হুগলী জেলার অন্তর্গত সেই গ্রাম—নাম তার কামারপুকুর। এ যুগের নব বৃন্দাবন রচিত হ'ল তারি শস্য শ্যামল মাটির বুকে। গয়াধামের বিষ্ণু পাদপীঠে ক্ষুদিরাম হলেন স্বপ্নাবিষ্ট স্বয়ং নারায়ণ আসছেন তাঁর ঘরে। প্রথমে ভয় বিস্ময় সচকিত অবস্থা, রাজাধিরাজকে কি দিয়ে সেবা করবো। অবশেষে ভগবানের অভয় দানে তার মুক্ত হয়ে পুলক আকুল চিত্তে ক্ষুদিরাম জানালেন আনন্দ বারতা। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়ার পয়লা গদাধর আবির্ভূত হলেন ধনশী চন্দ্রার কোল আলো ক'রে কামারপুকুর ধামে। সুরু হ'ল আর এক যুগের ইতিহাস।

শুক্লা ফাগুন দ্বিতীয়াতে জন্ম যে তোমার
ধরিত্রীরে ধন্য করি আনলে তারের জোয়ার
হে ঠাকুর অবতার বরিষ্ঠ সত্য সনাতন।
ধন্য পিতা ক্ষুদিরাম ধন্য চন্দ্রামণি
সাতটি তারার প্রবীন ঋষি বিবেকেরে আনি
হে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ধর্মচক্র করলে প্রবর্ত্তন।
বামন জন সাঙ্গপাঙ্গ হ'ল লীলাসঙ্গী
ঈশা তুমি মুসা তুমি সর্ব্বদেব সঙ্গী
হে ঠাকুর বন্দি—তোমায় নিত্য ওগো
নিত্য নিরঞ্জন।

গয়াধামের গদাধর পীঠের স্বপ্ন কথা স্মরণ ক'রে জনক-জননী পুত্রের নাম রাখলেন গদাধর। বাল গোপালের লীলা—চপল রূপ প্রকটিত হ'ল শ্রীধাম কামারপুকুরে। সেই বাল চাপল্যের মধ্যেই তিনি বারবার মূর্ত্ত হ'য়ে উঠলেন তাঁর স্ব-স্বরূপে। বারবার প্রকাশ হ'তে লাগলো তাঁর আগমন উদ্দেশ্য। গদাধরের বাল্যলীলায় সহযোগিতা করলো কামারপুকুরের সাধারণ মানুষের দল, আগন্তিক দৃষ্টিতে যারা ইতিহাসের পাতায় কোনদিনই চিহ্নিত হ'তে পারতো না, গদাধরকে কেন্দ্র ক'রে তারাই হ'য়ে উঠলো ইতিহাসের একটি বিশেষ অধ্যায়। গ্রামের স্কুলে যাদের দল হ'ল তার খেলার সাথী মানিকরাজার বন অঙ্গনে বসলো খেলার আসর। শুধু তাই নয়, সেই দীন দরিদ্র খেলুড়েদের নিয়ে গদাধর গ্রামের সম্ভ্রান্ত পরিবারেও যেতেন আনন্দ দান করতে। যাত্রা গান কথকতায় মুখর ক'রে তুলতেন গ্রামের ধনী দরিদ্র সবারই গৃহ। তাঁকে কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে উঠলো ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে দারিদ্র্যের একটি সুন্দর মৈত্রীর বন্ধন। সমন্বয়াচার্য্যের সমন্বয় সাধনের এও একটি দৃষ্টান্ত বৈচিত্র্য। রামলীলা, কৃষ্ণলীলা, শিবলীলা সবই ছিল গদাধরের কণ্ঠস্থ। যে সব পুরাণ কাহিনীর মধ্যে বেঁচে আছে ভারতের ধর্ম, ভারতের প্রাচীনত্ব, বাল-সুলভ আনন্দে ঘরে ঘরে, গদাধর তাঁর বালসাথীদের নিয়ে পরিবেশন করতেন সে সব কথা। তারি মধ্যে প্রকট হ'ত তাঁর দিব্যভাব সত্ত্বা। কখনও যাত্রার শিব সেজে শিবভাবে আবিষ্ট—আবার কখনও কৃষ্ণলীলার রাধা হয়ে সত্যকার কৃষ্ণ প্রেমে আকুল। আবার কখনও সাধুর মেলায় সাধু সেজে ভবিষ্যত জীবনের সূচনা ইঙ্গিত দান। এতো তাঁর বাউলরূপে আমার আভাস।

তুমি মোদের বাউল ঠাকুর
আমরা তোমার বাউল সাথী
তোমায় ছেড়ে ঘর ভুলেছি
এক করেছি দিবস রাতি।

আমরা তোমার পূজার কুসুম
ফোটাই প্রাণের কুঞ্জ ভরে

সোনা মোড়ি নাই কো মোদের
চোখের জলে মালা গাঁথি।
ফাগুন এলেই মনে পড়ে
এমনি দিনে আসো তুমি
শিউ কুহুদের সাথে মোদের
গানে ভরাই বনভূমী।
তোমার হাতে একতারা থাক
মন্দিরা থাক মোদের হাতে
প্রেম অজয়ের উজান বেয়ে
চলেই যাব হাসি কাঁদি।

এবার বাউলরূপে আসার একটি বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। যে বাউল, তার থাকে না কোনও সীমিত গণ্ডির বন্ধন। তাই এবার বিশ্ব পথের পথিক হয়ে, বিশ্ব বাউল হয়ে এলেন ভগবান। প্রতিটি মতও পথের বুকে আঁকা হয়ে গেল তাঁর পবিত্র চরণ চিহ্ন। বাল্য থেকে কৈশোরের সন্ধিক্ষণেই সুরু হ'ল সেই জয়-যাত্রা। জাতিভেদের সংকীর্ণতার মধ্যে হারিয়ে যাওয়া মানবতাকে তিনি টেনে আনলেন সকল স্তরের মানুষের সামনে স্পষ্ট দিবালোকে। একটি পবিত্র বন্ধনের সূত্র বুঁজে দিলেন জাতিতে জাতিতে বর্ণে বর্ণে। বললেন, ভক্তের জাত নেই। তাই বুঝি ব্রাহ্মণ সন্তান হ'য়ে ধনী কামারনীর কাছে গ্রহণ করলেন উপনয়নের ভিক্ষা। সেই দীন পল্লী জননী শ্রীসারদাদেবীর ভিক্ষামাতারূপে ইতিহাসের বুকে চিরস্মরণীয় হয়ে রইলেন। তৎকালীন সমাজ-পতিদের রক্ত চক্ষুকে অস্বীকার ক'রে খেলার ছলে ভেঙে দিলেন সব কুসংস্কারের গণ্ডী। ছুতোরের মেয়ে খেঁদির মা'র মত বহু নিম্ন শ্রেণীর মানুষের হাতে তাদের আকুতির ভোজ্য গ্রহণ ক'রে বোঝালেন—আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে সমস্ত বিভেদকেই অস্বীকার করা যায়।

আমরা নবীন দেশের মানুষ
আমরা ঠাকুর তোমারী
তুমি এলে নবীন ঠাকুর
আমরা তোমার পূজারী।
সাথ জেগেছে তোমায় নিয়ে
নোতুন জগৎ গড়বো গো
তোমার নামের জয় পতাকা
জীবন দিয়ে ধরবো গো
এ পথ শুধু তোমারি পথ
তুমিই মোদের দিশারী।
এই যে কালো আঁধার মাটী
এতেই সোনা ফলবে গো
সোনার দেশের মানুষ এল
এই তো সবে বলবে গো।
নূতন যুগের সূর্য্য আলোর
তোমার নূতন জন্মদিন
শাশ্বত সেই জন্মতিথি ভিন ভুবনের ঘরে লীন
সোনার পায়ে সোনার প্রণাম
সবাই দেবে উজারি।

যুগলীলার দ্বিতীয় পর্য্যায় সুরু হ'ল পুণ্যতোয়া ভাগীরথী তীরে যুগতীর্থ দক্ষিণেশ্বরে। গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমির এই পবিত্র সাধনপীঠে জ্বলে উঠলো এক জীবন সাধনার যজ্ঞানল। যে সাধনাকে বলা যেতে পারে মূর্ত্ত তপোব্রহ্মের নূতন সৃষ্টির তপস্যা। এ এক নূতন দৃশ্য। তমোগুণে আচ্ছন্ন মহাভারতের অন্তর্মুখিকে ভেঙে দিতে স্বয়ং নারায়ণ এবার সুরু করলেন দেব্যাস্তুতি। সর্বচেতনের চেতয়িতা মহাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে প্রথম সুরু করলেন শক্তি সাধনা। এ দেশ যে মায়েরই দেশ, মা ছাড়া সন্তানের মোহ নিদ্রা কে ভঙ্গ করবে? তাই স্বয়ং যুগাবতার গদাধর জীবন আহুতি দেওয়া সাধনায় জাগিয়ে তুললেন চিন্ময়ী জননীকে, দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণরূপে। ধন্য হলেন রাণী রাসমণি এবং তাঁর জামাতা মথুরা মোহন। যুগাবতারের দক্ষিণেশ্বর লীলার তাঁরাই তো প্রথম সাক্ষী। দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রে তাঁরাই তো প্রথম স্বাগত জানিয়েছিলেন ত্রিলোকের বরণীয় অতিথিকে।

হে রামকৃষ্ণ তোমার স্পর্শে
ধরণী হয়েছে পুণ্য তীর্থ

অমর ভারত আবার পেয়েছে
　　সত্য শিব নিত্য বিত্ত।
স্বর্গে মর্ত্যে মিলন মালা-গন্ধ পবন চন্দনে
ধন্যরে হে দেব দেবল মূর্ত্ত সপ্তলোক করিছে রিক্ত।
অটিল জটার পথিক গঙ্গা পদ্ম পেয়েছে অমৃতে
নয়ন তলে অলকানন্দাপূত করিছে
　　করিছে রিক্ত।

যাত্ত সাধনার পর—শ্রীরামকৃষ্ণ একে একে ভারত-তথা এশিয়ার প্রধান প্রধান ধর্মের সাধনাগুলি সার্থক ক'রে তুললেন নিজের জীবনে। বৈষ্ণব সাধনায় রাধা ভাবের অপূর্ব্ব বিকাশ ঘটলো তাঁর দেবদেহে। দর্শন হল হ্লাদিনী শক্তি রাধারাণীর। রামাইৎ সাধনায় দর্শন হ'ল সীতার। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের অঙ্গে দুটি শক্তিই হলেন বিলীন। বিশ্ব সাধকের সাধনাগ্নিতে সমিধ যোগাতে এলেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধক দল; আগন্তিক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণের গুরুরূপে। রামাইৎ সাধনায় এলেন জটাধারী। তাঁর আরাধিত দেবতা রামলালার সাথে শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্ময় লীলায় সৃষ্টি হ'ল এক নূতন ইতিহাস। তন্ত্র সাধনায় এলেন দেবী ভক্তপিনী যোগেশ্বরী, ভক্তরূপে। বেদান্ত সাধনায় এলেন তোতাপুরী। নিরাকার ব্রহ্মের অদ্বৈত সাধনা মূর্ত্ত হ'য়ে উঠলো শ্রীরামকৃষ্ণের নির্ব্বিকল্প সমাধিতে। শুধু তাই নয় যুগাবতারের সাধন পর্য্যায়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলিকেও স্মরণীয় ক'রে রাখতে এলেন কত অজানা অচেনা সাধক-সাধিকার দল। যেন নর দেহধারী নারায়ণের দেব দেহ রক্ষা করতে তাঁরা ঠিক মুহূর্ত্তটিতে এসেছেন, আবার প্রয়োজন শেষে কোথায় হারিয়ে গেছেন নাম গোত্রহীন পরিচয়ে। শুধু ইতিহাসের কয়েকটি পাতাকে স্মৃতি সুরভিত ক'রে রেখে গেছেন যুগনারায়ণের সেই অচেনা পূজারীর দল।

প্রেম ধূপ জ্বালি এসেছে পূজারী
　　লহ গো প্রণতি যুগাবতার
ভগীরথ সম আনিলে ধরণে
　　সমন্বয়ের সংসার।

তোমার যজ্ঞ হোম শিখানলে
　　ত্যাগের মেলিয়া বহ্নি যে জ্বলে
সর্ব্ব ধর্ম তীর্থ বহিতে
　　ভরিলে অমৃত কলস তার।

হেরিলে ব্রহ্ম সর্ব জীবে
　　হল একাকার জীবে ও শিবে,
অজ্ঞান তম হল বিদূরিত
　　দেবকীর বুকের পাষাণ ভার।

যুগে যুগে তুমি যুগের পাবন
　　মুক্ত করেছো মোক্ষদ্বার।

তপোরাজ্যের সমন্বয়ের সাধনের মূল শক্তির উদ্বোধনে, আর সে তপস্যার শেষ হ'ল মূর্ত্ত আদ্যাশক্তির চরণে আত্মসমর্পণে। কলহারিণী কালিকাপূজার ঘন অমাবস্যার নিশিথে এল সেই পরম শুভ লগ্ন। নীচে দক্ষিণেশ্বরের ভাগিরথী, আর উপরে লক্ষ তারকাখচিত আকাশ, সেই শুভলগ্নের পবিত্র সাক্ষী। একদিকে মা'র মন্দিরে চলেছে ভবতারিণীর পূজা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান; আর একদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের দেব প্রকোষ্ঠে বেজে উঠল নূতন পূজার সপ্তশঙ্খী। পূজারী ব্রহ্মসনাতন শ্রীরামকৃষ্ণ, পূজা ব্রহ্মসনাতনী সারদা দুর্গা। যুগদেবতা আগন্তিক বিবাহের বন্ধনে যাকে এনেছিলেন লীলা সঙ্গিনী ক'রে, তারই চরণ তলে সমর্পণ করলেন সমস্ত সাধনার ফল। আগন্তিক বন্ধনের মাঙ্গলিকসূত্র ভস্ম ক'রে তাঁকে ডাকলেন নূতন কণ্ঠে মা ব'লে "হে মাতঃ, হে অম্বে, হে ত্রিপুরা সুন্দরী মাতঃ" রবে দিগন্ত হ'ল উৎপূর্ণ। জননী সারদা তখন অষ্টাদশী চন্দ্রকলা। তাঁকে ষোলমহাবিদ্যার ষোড়শী রূপে পূজা করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। জপের মালার সঙ্গে বিল্ব-পত্রে নিজ নাম লিখে তাঁর চরণে অঞ্জলি দিলেন, সমর্পণ করলেন সমস্ত সাধনার ফল। প্রতিষ্ঠিত হল নব বেদান্ত যার মূল সূত্র হল ব্রহ্মই শক্তি, শক্তিই ব্রহ্ম। শ্রীরামকৃষ্ণ সারদার যুগলরূপে এ এক নূতনতম প্রকাশ।

জীবন পদ্মে স্পন্দিত হোক
　　রামকৃষ্ণ সারদা নাম

করুণ কান্ত রূপ অধরা
অঙ্গ সরস করুক প্রাণ।

ক্লান্ত তৃষিত দূরের পান্থ
তৃপ্ত হোক এ কর আশীষ
অন্ধকারের ভীতি হরণ
জাগাও তোমার মোহন ঠাম।

মর্ত্য মাটীতে স্বর্গ আসুক
তোমার কৃপায় যুগাবতার
শুচিত করি মুক্তির হিয়া
দাও হে দুঃখ শোকে ত্রাণ।

দক্ষিণেশ্বরের আনন্দ লীলার সৌরভ দিগদিগন্তে ছড়িয়ে পড়তেই ছুটে এল ভক্ত ভ্রমরের দল। রস স্বরূপ ভগবানের রস, রসিক ভক্ত ছাড়া কে আস্বাদন করবে। ঠাকুর ডাকলেন "ওরে তোরা কে কোথায় আছিস!" সে ডাকের টানে একটি একটি ক'রে এসে মিললো কলমী-লতার দল। এল নরেন, কালী, রাখাল প্রভৃতি অন্তরঙ্গ লীলা সাথীরা—এল গৃহী ভক্ত রাম, বলরাম, গিরিশ। সে লীলায় যোগ দিলেন সে যুগের মহারথীগণ কেশব, বিজয়, দয়ানন্দ প্রভৃতি। দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতল হল কথামৃতের হরি কথা কীর্ত্তনে মুখর। সে হরিকথা কীর্ত্তনের সুর আজও সুরসরিতের অমৃতধারার মত বিশ্ব হতে মহাবিশ্বে প্রবাহিত—অনুরণিত—অনুভাষিত। কে আর হে আর্ত্ত কে আর পিপাসিত এস, মিলিত হও। এই প্রেম জাহ্নবীর তটে। পান কর সেই মহানামামৃত। প্রণাম জানাও সেই মহাপ্রকাশকে—মুখরিত কর দিক দেশ শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আর তাঁর ভক্তমণ্ডলীর জয়নাদে। জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ।

জয় নবীন গদাধর সারদা-সুন্দর
দেবদেবং ভজ দেবদেবম্।
জয় ক্ষুদিরাম শ্রীজন চন্দ্রা মানস ধন
দেবদেবং ভজ দেবদেবম্।
জয় নন্দন নন্দিত মণ্ডন লাহিড়
দেবদেবং ভজ দেবদেবম্।
জয় খঞ্জন-লোচন চিনু-বিষ্ণু মন
দেবদেবং ভজ দেবদেবম্।
জয় গোপন নর্ত্তন কৃপাভনু ধারণ
দেবদেবং ভজ দেবদেবম্
জয় কথামৃত-ধারক যুগ-বিধায়ক
দেবদেবং ভজ দেবদেবম্।
জয় গৌরী-বিমোহন লক্ষ্মী লীলাঙ্গন
দেবদেবং ভজ দেবদেবম্।
জয় নরেন্দ্র-বন্দন অভেদ-মণ্ডন
দেবদেবং ভজ দেবদেবম্।
জয় ব্রহ্মানন্দময় অমৃত মন্ত্রিয়র
দেবদেবং ভজ দেবদেবম্।
জয় গদাধর-প্রেম-সারদা-শিবক্ষেম
দেবদেবং ভজ দেবদেবম্।
জয় যোগীন্দ্র-অঞ্জন মুবোধ-নিরঞ্জন
দেবদেবং ভজ দেবদেবম্।
জয় তুরীয় ত্রাণকারী অদ্বৈতাতীত চারী
দেবদেবং ভজ দেবদেবম্।
জয় শ্রীমতী-নির্মল-প্রেম মুমঙ্গল
দেবদেবং ভজ দেবদেবম্।
জয় গিরিশ—শাসক সুরেন্দ্রনায়ক
দেবদেবং ভজ দেবদেবম্।
জয় কেশব-বলরাম-মহেন্দ্র মোহন
দেবদেবং ভজ দেবদেবম্।
জয়রাম-কেদারকপ দুর্গাচরণ-কৃপ।
দেবদেবং ভজ দেবদেবম্।
জয় দেবেন্দ্র পূর্ণ হরি অক্ষয় অবতরি
দেবদেবং ভজ দেবদেবম্।
জয় ধর্ম সমন্বয় মুক্তি চিরায়ন
দেবদেবং ভজ দেবদেবম্।

—:০:—

ক্ষমা

শ্রীমতী জগপ্রভা ভাদুড়ী

"প্রভু ওদের ক্ষমা করো। অজ্ঞানতার জন্য কি করছে ওরা জানেনা তাই এ কাজ করছে। তুমি ওদের ক্ষমা করো"—ক্রুশ বিদ্ধ হয়ে বললেন, ভগবান যীশু। ক্ষমা অতি অপার্থিব জিনিষ। অতি সুন্দর আনন্দময়। পবিত্র ও কল্যাণময় তার সত্তা। মরণোন্মুখ মানুষকে সে নবজীবন দান করতে পারে। কুপথগামীকে সুপথে আনতে পারে। সংসারী মানুষকে নানাভাবে শান্তি দিতে পারে। তাই মনে হয় ক্ষমাই মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম ও একটি বিশেষ সংগুণ। এর মূলে আছে দরদী মনোজাত নির্মল ভালোবাসা। অসীম ধৈর্য ও সহ্য শক্তি। অন্তঃকরণ বড় না হলে চিত্তবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ লাভ ঘটে না। ফলে সদ্‌গুণের প্রকাশও সম্ভব হয় না। মানুষ যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ বললেন, "আর কিছু না, ওধর্মে গিয়ে আমার বুকটা বড় হয়ে গেছে"— তিনি স্বয়ং শিবাবতার : শ্রীরামকৃষ্ণময় প্রাণ। তাঁর কাছে আবার ছোটো বড় কি ? তার অর্থ ওই ভোগবাদী দেশের মানুষের মন তিনি নিষ্কাম ভালোবাসার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলেছিলেন। তারাও বুঝতে পেরেছিল এই আমি বোধই সব নয়। এর পিছনেও কোনও মহাশক্তি আছে। এই যে মিলন, পরস্পরের সঙ্গে, এই পরম বোধেই ভরে উঠেছিল স্বামিজীর অন্তর। সভ্য মানুষ শুধু লোভ আর হিংসার পিছনে উন্মত্তের মত ছুটে বেড়াচ্ছে। যার ফলে দেশে দেশে খণ্ড ও মহাযুদ্ধ লেগেই আছে। সকলেই সকলের শুধু ভুল ত্রুটি গুলো দেখে আর তার প্রতিশোধ নিতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রে ছোটো ছোটো স্খলন পতনের ক্ষমা আছে, কিন্তু সে দিকে দৃষ্টি দেবার কারো সময় বা অভিলাষই নেই। স্বামিজী চেয়েছিলেন তাদের বহির্মুখী মন অন্তর্মুখী হোক। তারা প্রকৃত শান্তি ও আনন্দের অধিকারী হোক। ক্ষমা গুণে তারা উদ্বুদ্ধ হোক।

আমাদের ঠাকুর বললেন—"স্বামিজীর বক্তৃতার পর লোকে খানিক্ষণ অবশ হয়ে বসে থাকতো। এদের আত্মার চৈতক শক্তি প্রকাশিত হয়েছিল"। (বেদমন্ত্র) ক্ষমা গুণে মানুষ পারে না এমন কোনও কাজ নেই। কিন্তু এজন্য আগে মনের প্রস্তুতির দরকার। আজকের মানুষের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, আদর্শ, বড় বড় কথা মুখে বলা যত সহজ, কাজে করা অতটা সহজ নয়। সে কথা খুবই সত্য ; কিন্তু বড় কাজ করতে আমরা চেষ্টা করবো না কেন ? চেষ্টা করলে কি না হয় ? তবে সে চেষ্টার মধ্যে কর্মের প্রতি বিশ্বাস ও অনুরাগ থাকা চাই। আমাদের ঠাকুর বলেছেন—"আমরা কেন ধূলির উপর উঠবো না। কেন আমরা ছোট হবো। ধূলির উপর উঠতে না পারলে সেবত্ত হওয়া যায় না।" (বেদমন্ত্র) সংসারে ছোটো বড় সমস্ত কাজ আমরা যদি একটু তলিয়ে দেখে বিচার করি তাহলে সব উদ্‌ভ্রান্তির মধ্যেও মন একটু শান্ত ও স্থির হবে। সব দোষে দোষীকেও ক্ষমা করে কাছে টেনে নিতে দেরী হয় না। দোষী তখন নিজের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সজাগ হয়ে অনুতপ্ত হয়। তার মনেও ক্ষমার ভাব জেগে ওঠে। এ পথে জ্যেষ্ঠদের অগ্রণী হয়ে কনিষ্ঠদের পথ দেখাতে হবে প্রথমে।

পাওহারী বাবার আশ্রমে কোনও সময়ে এক নিশুত রাতে চোর ঢুকে সন্ন্যাসীর যা সম্বল তাই অপহরণ ক'রে নিয়ে পলায়ন করে। ধ্যানের মধ্যে পাওহারী বাবা সে ঘটনা জানতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে আসন ছেড়ে উঠে

নিজের বাকী যা কিছু ছিল সমস্ত সামগ্রী পলায়নরত চোরকে ডেকে দিয়ে দিলেন। পরে এই চোর সাধু হয়েছিল। এই হোলো ক্ষমার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

তবে সব ক্ষেত্রে অন্যায় সহ্য করা উচিৎ নয়। তাতে সমষ্টির অকল্যাণ হয়। মানুষকে নিজ নিজ বিচার বুদ্ধির উপর কার্য কারণের গুরুত্ব নির্ভর করতে হবে। যদিও জানি সমস্ত ভালো-মন্দের সুবিচার করার ক্ষমতা মানুষের সাধ্যাতীত। একমাত্র ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই। যেমন ধূলা কাদামাখা শিশু কাঁদতে কাঁদতে যার কাছে গিয়ে কোলে ওঠার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়, মা তাকে কোলে তুলে নেয়। মানুষও তেমনি ব্যাকুল হয়ে তাঁর কাছে ছুটে গেলে তিনি কৃপা করে তাকে ধূলা কাদা থেকে তুলে নেন। তখন মানুষের মনের তদাতত বোধ শক্তির পূর্ণ জাগরণ হয়। এর পূর্ণতম পবিত্রতম নিদর্শন রয়েছেন আমাদের শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী। তিনি ছিলেন ক্ষমাগুণের পরমোজ্জ্বল দিব্য দিশা। ছেলে মেয়েদের কাছে তাঁর চরিত্রজীবনের সর্বশেষ কথা—"যদি শান্তি চাও মা, কারো দোষ দেখোনা। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার ক'রে নিতে শেখো, কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার"—

"কারো দোষ দেখোনা"—এই একটি বাণীর মধ্যে ক্ষমার সুন্দর শান্ত রূপটি প্রোজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। আমরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মন খুলে মেলা-মেশা করতে পারি না শুধু এই কারণে। কাজে কথায় সর্বত্র আমরা শুধু মানুষের দোষ ত্রুটি বড় ক'রে দেখি সর্বদা। দোষ ভুল এসব তো মানুষই করে কিন্তু তাদেরই আবার নিজেকে সংশোধন ক'রে নেবার সুযোগ দিতে হবে। এর ফলে প্রত্যেকের জীবনে শত সমস্যার মধ্যেও একটু স্বস্তি থাকবে, একটু শান্তি থাকবে। মন শান্ত পবিত্র ও আনন্দময় থাকলে সেখানে ধারা পড়বে শ্রীভগবানের। তাঁর পূজায় একটু স্থির হয়ে বসতে পারবে।

প্রতি হিন্দু ঘরেই দেব বিগ্রহ সেবা পূজা পার্বণ ইত্যাদি নিত্য নৈমিত্তিক কাজ। তবুও একটী বিষয় একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। এ যুগের ছেলে মেয়েদের মধ্যে ধর্মবোধ, দৈববিধে ভক্তি বিশ্বাস, গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রভৃতি ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। উপনয়নের অনুষ্ঠান পর্ব শেষ হয়ে গেলেই উপবীতের কথা ছেলেদের আর স্মরণে থাকে না। পূজাপাদে প্রণাম, সম্মানীয়দের সম্মান প্রদর্শন ইত্যাদি ক্রমশঃ মানুষের মন থেকে মুছে যাচ্ছে। গুরুজনদের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস না থাকার ফলে তাদের পথ চলায় অনেক ত্রুটী বিচ্যুতি ঘটে যায়। যার ফলে তারা নিজেরাই শাস্তি ভোগ করে বেশী। আর এই কারণে অভিভাবকদের পরিণত জীবনে অশান্তির সীমা শেষ থাকে না। এজন্য দায়ী অভিভাবকবৃন্দ নিজেরাই। শিশুকাল থেকেই ছেলেমেয়েদের মনে ভগবদ্ভক্তি ও প্রীতি জাগিয়ে তুলতে হয়। সকাল সন্ধ্যায় শ্রীঠাকুরের নাম প্রণাম ইত্যাদি করতে শেখাতে হয়। ঠাকুরের ঠাকুরালীর নীতি কথা, পুণ্য কথা, গল্পচ্ছলে তাদের শোনাতে হয়। এসব পুণ্য কথা সরল শিশুমনে মন্ত্রের মত কাজ করে। ধ্রুব ও প্রহ্লাদের হরিভক্তি, একলব্যের গুরুভক্তির কাহিনী শুনে তারা চোখের জলে ভাসে। কিন্তু সেই চোখের জলে তাদের মনের নরম মাটিতে হরিভক্তির বীজ চিরদিনের জন্য বপন হয়ে যায়। দেশীয় প্রথাকে পুরানো মত বা সেকেলে প্রথা বলে বর্জন করার আগে তার মধ্যে সুবিবেচনা বোধ জেগে উঠবে যে, প্রকৃতই তার মধ্যে অকল্যাণকর বা নিন্দনীয় অথবা দৃশ্যকটু কোনও বস্তু আছে কি না? নিন্দা প্রশংসা তো আমরা নিজেরাই নিজেদের করি। এ সম্বন্ধে সমাজের অভিভাবকবৃন্দ একটু সচেতন হলে সংসারের অশান্তি মনস্তাপ ইত্যাদি অনেকাংশে হ্রাস পায়। শিক্ষা নিকেতনের উচ্চমানের পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে না পারলে দু'জন বিদ্যার্থী আত্মাহুতিতে জীবনাবসান ঘটাচ্ছে। একটু ভগবদ্ভক্তি, আত্মবিশ্বাস, ধৈর্য্য, পিতামাতার উপর ভালোবাসা—কিছুই তাদের স্মরণে আসে না। অদ্ভুত আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব। দুয়ারে বা পথে ভিখারী দেখলে তাদের অবজ্ঞা

অথবা অবিশ্বাস করাই আজকের নীতি। সমস্তই যদি অবিশ্বাস্য তবে বিশ্বাসযোগ্য কি, অথবা কে? পৃথিবীতে নির্ভরতা কোথায়?

এই দিনের ছবি—ভবিষ্যৎ নেত্রে দেখতে পেয়েই শ্রীমা সারদা বলেছিলেন, "দোষ তো মানুষ করবেই। ও দেখতে নেই। ওতে নিজেরই ক্ষতি হয়। দোষ দেখতে দেখতে শেষে দোষই দেখে।"—

আজকের মানুষের হয়েছে—সেই অবস্থা। ভালোমন্দ বিচারের বোধ শক্তিই তার লুপ্ত হয়ে গেছে। আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবই এরজন্য দায়ী। এইজন্য প্রত্যেক মানুষকে সময় ও সাধ্য অনুযায়ী সাধুসঙ্গ ও সৎসঙ্গ করতে হয়। সৎ গ্রন্থ ও মহাপুরুষদের জীবনী পাঠ অবশ্য কর্তব্য। এর ফলে মানুষের মনে ভগবদ্ভক্তি, ও তাঁর প্রতি ভালোবাসা জেগে ওঠে। মনের যত আঁধি ঘুচে যায়। তখন আর কোনও ভয় থাকে না।

নদীয়ার পথে পথে মহানাম, মহাপ্রেম বিতরণ করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। আকাশ বাতাস উতল পাতাল ক'রে ভেসে বেড়াচ্ছে সেই সকরুণ প্রেমবাণি। ওরে গৃহবাসী, গ্রামবাসী, তোরা ওঠ, জেগে ওঠ, পান কর এই মহানামের অমৃত সুধা। দেখ, এই নামের মধ্যে লুকিয়ে আছে কি অপার শান্তি অফুরান আনন্দ। আয় আয়, সবাই ছুটে আয়। দলে দলে মানুষ ছুটে এসে লুটিয়ে পড়ছে সেই নবীন সন্ন্যাসীর চরণ প্রান্তে। চোখের জলে ভিজে উঠছে মাটী। এমন সময় নেশায় উন্মত্ত জগাই মাধাইয়ের অতর্কিত নিষ্করুণ আঘাতে নিত্যানন্দ প্রভুর দেব ললাট রক্তে বিক্ষত হয়ে ঝরতে লাগল অবিরল রুধির ধারা। ভক্তেরা মহাক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে গেল দুরাচারীদের দিকে। মহাপ্রভু মিষ্ট ভাষণে তাদের ক্রোধ নিবৃত্ত করে, দুরাচারীদের সামনে নিয়ে তাদের সুপথে আসার জন্য আহ্বান জানিয়ে বললেন, "মেরেছো কলসীর কাণা তাই বলে কি প্রেম দেবো না।"

কত বড় শিক্ষা, কত মহৎ ক্ষমা, পৃথিবীর ইতিহাসে এর নিদর্শন আর একটিও মিলবে না। ভগবান যীশু বলেছিলেন,—"তোমার এক গালে চড় মারলে অন্য গাল এগিয়ে দেবে।"

তাও সেটা প্রহারের পূর্বের কথা। আর এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে। মহাপ্রভুর কৃপালাভে ধন্য হয়ে সেই দুরাচারীরা পরে সৎ ও সংযত চরিত্র মানুষ হয় এবং নতুন নাম পায় জগাই মাধাই। তারা প্রভুর কীর্তনীয়াদের দলের অগ্রভাগে থেকে নেচে গেয়ে আনন্দে নাম বিতরণ করতো। সেই প্রহারোদ্যত হাতে মধুর ধ্বনি বাজতো শ্রীখোল, শ্রীকরতাল। সত্যই যাদের জীবনের পরম পাথেয় গুরুকৃপায় তারা বাহ্যিক কলনাতে পূর্ণতা পায়। এই পথ অনুসরণের প্রথম ও প্রধান সোপান সকলের প্রতি ভালোবাসা ও ক্ষমা। অনুপম ক্ষমা।

ভালো হোক সবাকার করি এ কামনা
বর লভি' ঈশ্বরের ঘুচুক যন্ত্রণা:
মুখে মনে ভক্তি-ভরে ইষ্টদেবে ডাকো
(থরা হবে সংসারের—মন ভাবে রাখো।

—শ্রীরূপাবন চক্রবর্তী (কাব্যতীর্থ)

কুমারী পূজা

সাধনাপুরী

নিখিল বিশ্বের আদিভূতা সনাতনী জগজ্জননীর অসংখ্য রূপের মধ্যে তাঁর কুমারী গৌরী রূপটি যেন একটি বিশেষ প্রকাশ। শ্রীশ্রীচণ্ডীর মধ্যে আমরা একাধিকবার মায়ের কুমারী রূপের বর্ণনা পাই,—

'কৌমারী শক্তি রূপা চ ময়ূর-বর-বাহনা।'

'দৈত্যাঞ্ছান কৌমারী তথা শক্ত্যাতিকোপনা।'

'শক্তা ত্বঞ্চ কৌমারী বারাহী চ তথাপরা।'

'কৌমারী-শক্তি-নির্ভিন্নাঃ কেচিন্নেত্যর্মহাসুরাঃ। —ইত্যাদি ইত্যাদি।

আবার চণ্ডীর একাদশ অধ্যায়ে পাই :—

'ময়ূর কুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরেঽনঘে।

কৌমারী-রূপ-সংস্থানে নারায়ণি নমোঽস্তুতে।"

হে দেবী! আপনি ময়ূর ও কুক্কুট বেষ্টিতা মহাশক্তিধারিণী, অপাপবিদ্ধা বা নিষ্পাপা কুমারী শক্তি-রূপিণী, হে নারায়ণি আপনাকে প্রণাম।

জগজ্জননী অষ্টম বর্ষিয়া বালিকা রূপ ধারণ করে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে একাধিক দিন বিলাস করেছেন। কখনও শ্রীঠাকুর দেখছেন মা ভবতারিণী লাল চেলী পরে ছোট্ট মেয়ের রূপ ধরে কড়িং ধরছেন। কখনও মা অষ্টম বর্ষিয়া বালিকা রূপ ধরে মল পরে রুম রুম করে মন্দিরের চূড়ায় উঠছেন, আর শ্রীঠাকুর তা পাচ্ছেন ও সাবধান করছেন, 'ওরে নেমে আয় পড়ে যাবি।' আবার কখনও দেখছেন বালিকার রূপে মা ভবতারিণী এসে ঠাকুরের সঙ্গে ভক্তি নষ্টি করছেন, কপালে তিলক আমার হাতে যুদি সেজাই নাই।

মাতৃশক্তিকে বালিকা মূর্তিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন একাধিক বার দর্শন করেছেন, সাধক রামপ্রসাদকেও তেমনি কুমারী বালিকা কন্যা সর্বমঙ্গলার রূপ ধরে বেড়া বেঁধে দিয়ে গেছেন।

তাই অপাপবিদ্ধা কুমারী বালিকার পবিত্র দেহমধ্যেও জগজ্জননীর আবির্ভাব চিন্তা করে কুমারী পূজা হিন্দুরা ভক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে করে থাকেন। দুর্গা পূজার সময়ে যেমন ঘট স্থাপন করে ঘটের মধ্যে মা জগজ্জননীর আবাহন করে পূজা করা হয় তেমনি মানব কুমারীর দেহমধ্যে মা জগজ্জননীর রূপ কল্পনা করে বা আবির্ভাব প্রার্থনা করে কুমারী পূজার বিধি প্রায় সর্বত্রই আছে। দুর্গা পূজার সময়ে বহু পূজা মণ্ডপেই মহাপূজার এটি একটি অনুষ্ঠান। অষ্টমী পূজার দিন এই কুমারী পূজা করা হয়।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব কুমারী পূজা করেছিলেন—স্বামী বিবেকানন্দও ক্ষীরভবানীতে একটি মুসলমান কুমারীকে পূজা করেন জগদম্বা জ্ঞানে। জগন্মাতা শ্রীমা সারদা দেবীও রাধু প্রমুখকে কুমারী পূজা করেন। এই প্রথা অনুযায়ী আমাদের শ্রীঠাকুর সন্ন্যাসসঙ্ঘেরও কুমারী পূজা খুব ভালবাসতেন।

কুমারী পূজার কথা ভাবতে গিয়ে কত দিনের কত কথাই মনে পড়ে। বহুদিন আগের কথা—আমাদের শ্রীঠাকুরের আশ্রম তখন সবে সুরু হয়েছে কি হয়নি তখন শ্রীঠাকুর সিউড়ীতে নিজ পৈতৃক ভিটায় কুমারী পূজা করেন। আমাদের সন্ন্যাসিনী মহামায়াপুরী তখন খুবই ছোট। খুব সম্ভবতঃ পঞ্চম বর্ষিয়া, নাম তখন মহামায়া

যোষ। শ্রীঠাকুর তাকেই প্রথম কুমারী পূজা করলেন। কলকাতা থেকে সিল্কের দামী শাড়ী, ভালো শাঁখা, নোওয়া সুগন্ধ তেল মিষ্টি ইত্যাদি সবই কলকাতা থেকে কিনে এনে বিধিবৎ খুব উপচারের সঙ্গে কুমারী পূজা করলেন মহামায়া ঘোষকে। আর পূজা শেষে উপস্থিত ভক্তকে বললেন—'মার আবির্ভাব হয়েছে কুমারীর মধ্যে, তোমরা অভীষ্ট অনুযায়ী বর প্রার্থনা কর।' সেই সময়ে নরেন চট্টোপাধ্যায় নামে এক ভক্ত খুব যাতায়াত করতেন, তার তখন আর্থিক সঙ্কট চলছিল, সেই ভদ্রলোক চাইলেন অর্থ আর আমাদের স্বামী উমানন্দ তখন ছাত্রমহলে হালুমাষ্টার নামে খ্যাত, তিনি চাইলেন বিদ্যা। যাই হোক, এই দুই জনেরই অভিলাষ অনেকটাই সিদ্ধ হয়েছিল।

কুমারী পূজা এইভাবে আশ্রমে প্রায় প্রতি বছরই দুর্গা পূজার সময় অনুষ্ঠিত হতে সুরু হল। শ্রীঠাকুরের মা, আমাদের পূজনীয়া ঠাকুরমা কাশীশ্বরী দেবী ও মানিক জ্যাঠার মা যথাক্রমে দুইজনেই যতদিন বেঁচেছিলেন বিধিবৎ কুমারী পূজা করে গেছেন।

আশ্রমের প্রথম দিকের কথা, আমি তখনও বাড়ী থেকে যাতায়াত করি। সে বোধহয় ১৩৪৯ সালই হবে। আমার পূর্বাশ্রমের মা কাশীশ্বরী একবার কুমারী পূজা করেন। তখন হেমন্তের শেষ কি শীতের সুরু ঠিক মনে নাই, বাড়ী থেকে সমস্ত আয়োজন করে এনে শ্রীঠাকুরের ওপরের ঘরে মা অর্চনাদিকে কুমারী পূজা করেন। বেনারসী শাড়ী গৈরিক রঙ করে আর সেই সঙ্গে নিজ হাতের তৈরী ঠাকুরের সুন্দর আসন ইত্যাদি ও আরোও অন্যান্য ব্যবহার্য্য জিনিষ, নিজ হাতের তৈরী ভোগাদি কোন আয়োজনের ত্রুটীই মা করে নি। এছাড়া নিজ হাতে গাঁথা চন্দ্রমল্লিকার মালা, চন্দ্রমল্লিকার মুকুট, বাজু বালা ইত্যাদি গেঁথেও মা এনেছিলেন। অর্চনাদিকে সেই মালা, মুকুট, শাড়ী ইত্যাদি পরিয়ে কপালে সিঁদুরের টিপ ও চন্দন দিয়ে সাজিয়ে দিল, অর্চনাদি ধ্যান করতে সুরু করল। শ্রীঠাকুর মন্ত্র বলিয়ে দিলেন, মা পূজা করল। অর্চনাদিকে তখন দেখতে খুব সুন্দর লাগছিল। পূজা শেষে মা আমাকে বললেন, 'কিছু চেয়ে নে' আর অর্চনাদিকে বললেন, 'একে আশীর্ব্বাদ কর মা'। অর্চনাদিকে দেখতে তখন আমার এত ভাল লাগছিল যে চাইবার কথা ভুলে গিয়ে শুধু বুকে জড়িয়ে ধরলুম, অর্চনাদি খুব লজ্জা পেয়ে গেল, হাসতে হাসতে মৌন আশীর্ব্বাদ করল। যাই হোক অর্চনাদিই তখন মন্দিরে নিত্য পূজা করত। পূজার সময় হয়ে গেছে বলে নীচে মন্দিরে চলে গেল। আমার মা তখন শ্রীঠাকুরকে অর্চনাদির স্বরূপ সম্বন্ধে নিজ ধারণার কথা বলে প্রশ্ন করলেন। উত্তরে শ্রীঠাকুর অর্চনাদির স্বরূপ সম্বন্ধে, পূর্বজন্ম সম্বন্ধে কিছু কথা বললেন, আরও বললেন, 'অর্চনা একদিন ধ্যান করছিল, তখন আমি দেখলাম ওর মাথা ঘিরে জ্যোতি ঠিকরে পড়ছে। বিশেষ শুদ্ধ আধার, একটু বিশেষ নজরে মা কাছে কাছে রাখি। ও আমার মানসকন্যা।'

কুমারী পূজা সম্বন্ধে আরও একটি দিনের কথা বিশেষ মনে পড়ে। সাল তারিখ অবশ্য মনে পড়ে না। দুর্গা পূজার মহাষ্টমীর দিন, দুবলার তৈরব বয়রা, শ্রীঠাকুরের পরমা ভক্ত, এক গাঁঠরী নতুন বস্ত্র নিয়ে এসে শ্রীঠাকুরের চরণতলে নামার বিতরণের জন্য। শ্রীঠাকুর তার মধ্য থেকে আটটি সাদা শাড়ী নিয়ে বললেন গেরুয়া রঙ করে দিতে। শ্রীঠাকুর আরও বললেন, 'কাল আমার একটু কুমারী পূজা করবার ইচ্ছা আছে।' শ্রীঠাকুর পূজা করবেন সেজন্য ফুল, চন্দন, ধূপ, নৈবেদ্য সিঁদুর ইত্যাদি জোগাড় সব কিছু কল্যাণী মায়েরাই ক'রে দিলেন।

শ্রীঠাকুর সিউড়ী আশ্রমে দোতলার ওপরে নিজের ঘরে আসনে বসেছেন মা ভবতারিণীর নিত্য পূজায়—পূজা শেষে আমাদের সকলকে শ্রীঠাকুরের কাছে বসতে বললেন। আমি, অর্চনাদি, সুষমাদি, সরলাদি, গীতা, আরাধনা, ও যোগমায়া এই কয়জনে ঘেঁসাঘেঁসি করে মালার মত সাজিয়ে বসলুম। শ্রীঠাকুরের সেই ভাবগম্ভীর

ঘরখানে শ্রীমুখ দর্শনে আমরা কেমন বিহ্বল হয়ে গেলুম। জোড় হাত করে বসে রইলুম। শ্রীঠাকুর সকলের কপালে সিঁদুর ও চন্দন দিলেন তারপর বেশ কিছুক্ষণ প্রথমে মা ভবতারিণীর দিকে তারপরে বেশ কিছুক্ষণ করে আমাদের প্রত্যেকের দিকে চেয়ে রইলেন—শ্রীঠাকুরের দৃষ্টিতে আমাদের মধ্যে বিশেষ শক্তি প্রবেশ করতে লাগল এটা বেশ বুঝতে পারলুম। এরপর শ্রীঠাকুর আমাদের সকলের মাথায় একে একে পদ্ম ফুল চন্দন বেলপাতা দিয়ে পূজা করলেন, মন্ত্রও বললেন, 'হে বালে, হে সর্ব্বশক্তির অধীশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরী, সিদ্ধি আর উন্মুক্ত কর; এদের শরীর মনকে পবিত্র করে এদের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে সর্ব্বকল্যাণ সাধন কর। হে সর্ব্বমঙ্গলের মঙ্গলরূপে, হে সর্ব্বকর্ম নিষ্পন্ন কারিণী, হে শরণ দায়িনী, ত্রিনয়নী, শিব মোহিনী গৌরী, হে নারায়ণী তোমাকে প্রণাম।'

শ্রীঠাকুরের ভাবগম্ভীর কণ্ঠের ওই মন্ত্র শুনে আমাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। মা দুর্গার চিন্তায় ও দর্শনে মন তন্ময় হয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ পরে সম্বিত ফিরে পেয়ে আমরা চোখ চাইলুম। শ্রীঠাকুর আমাদের সকলের কোলের ওপরে নতুন বস্ত্র দিয়েছেন দেখলুম। শ্রীঠাকুর আমাদের সকলের হাতে প্রসাদ দিলেন ও বললেন, 'আমার কাছে কুমারী পূজা নিয়েছ—সারা জীবন একথা মনে রাখবে আর নিজেদের মা ভবতারিণীর অংশ জানবে। সমস্ত পঙ্কিলতা, ভোগ, বাসনার ঊর্দ্ধে মন তুলে রাখবার চেষ্টা করবে। এমন ভাবে চলবে যেন কোন হীন দৃষ্টি, প্রভুক দৃষ্টি তোমাদের ওপর পড়তে সাহস না পায়। আর সর্ব্বোপরি পবিত্রতা বজায় রাখবে।'

আমরা এরপর শ্রীঠাকুরকে প্রণাম করলুম ও সানন্দে শ্রীঠাকুরের দেওয়া বস্ত্র পরে এসে আবার প্রণাম করলুম। পরে শুনেছিলুম আমরা যখন শ্রীঠাকুরের পূজার সময় ধ্যান করছিলুম তখন শ্রীশ্রীঠাকুরেরই ইচ্ছায় বর্ধীয়ান সাধুরা ও মায়েরা অনেকেই সেই সময় আমাদের পূজা করেছিলেন। আমাদের মধ্যে রুথী হঠাৎ সেদিন অসুস্থ হয়ে পড়ায় কুমারী পূজার সময় সে বসতে পারে নি কিন্তু তার জন্য রঙ করা কাপড়খানি পরের দিন ঠাকুর তাকে দিলেন।

এরপর থেকে প্রতি দুর্গা পূজার বেলা মা, পুষ্প মা, কৃষ্ণাবাসের ছোট মা আমাদের সকলকে নতুন কাপড় দিতেন ও দুর্গাষ্টমী পূজার দিন সকলকে কুমারী পূজা করতেন। আর অর্চ্চনাদিকে আরও অনেকেই পূজা করত। সতী মা, শোভা মা, অমলা মা, অনিতা মা, ইত্যাদি মায়েরাও কুমারী পূজার সময় অঞ্জলি দিতেন তবে সকলের চেয়ে বেলা মা কুমারী পূজায় বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। ওই তপঃক্লিষ্ট ক্ষীণ শরীর নিয়েই নিজেই ফল, মিষ্টি, ফুল চন্দন সমস্ত জোগাড় নিজেই করতেন আর পূজা বাড়ীতে শ্রীঠাকুরের কাজে ব্যস্ত আমাদের সকলকে একান্ত আকুতিতে টেনে এনে বসিয়ে পূজা করতেন।

সীতানাথ কাকাও যে বছরে সন্ন্যাস নিলেন আমাদের সকলকে কুমারী পূজা করেন।

কুমারী পূজার কথায় আরও একটি আনন্দ বেদনামিশ্রিত দিনের কথা মনে পড়ে। ১৯৬৭ সালে শ্রীঠাকুরের দেবদেহ যখন একেবারেই ভাল যাচ্ছে না—নানা উপসর্গ দেখা দিচ্ছে তখন আমরা অনেকে মিলে পরামর্শ করে শ্রীঠাকুরের কোষ্ঠী অতুল চরণের কাছে পাঠালুম।

অতুলচরণ কোষ্ঠী বিচার করে বিধান দিলেন গ্রহশান্তি করানো উচিৎ। গ্রহশান্তি যজ্ঞাদি আমি নিজে করব আর শ্রীঠাকুরের সন্ন্যাসিনী কন্যারা নয় জন একাসনে বসে নয়দিন ধরে হোম করবেন, প্রত্যেকে লক্ষ্যাধিক দুর্গানাম ও ইষ্টমন্ত্র জপ করার পর হোম শেষ করবেন। অতুল চরণের বিধানে যজ্ঞ সুরু হল অতি নিষ্ঠার সঙ্গে। নয়দিন ধরে যজ্ঞানুষ্ঠানের শেষ দিন নয়টি সুলক্ষণা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণ কন্যাকে ষোড়শোপচারে কুমারী পূজায়

আয়োজনও আমরা সকলে করলুম। প্রত্যেকটি কুমারীকে বস্ত্র, আলতা, সুগন্ধ তেল, শঙ্খ, সিঁদুর, নোওয়া, ফুলের মালা, কাঁসার থালা, ফল, মিষ্টি, চুল বাঁধবার ফিতে, আয়না, চিরুণী ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়ে আমরা যখন পূজা করছি শ্রীঠাকুরের দেব দেহ সুস্থ থাকার এই প্রার্থনা নিয়ে—শ্রীঠাকুর তখন প্রয়োজন বশতঃ হলঘরের মধ্যে এসে পড়েন ও আমাদের পূজা দেখে খুব খুশী হন। পূজা শেষে কুমারীদের ভোজন করানো হল, দক্ষিণা দেওয়া হল ও প্রত্যেককে সন্তীমা কোলে করে শ্রীঠাকুরের ঘরে নিয়ে গিয়ে প্রণাম করালো। শ্রীঠাকুরের দেব অঙ্গের কুশল কামনায় আমাদের যজ্ঞ, জপ, তপস্যা, বিশেষ করে কুমারী পূজাদি দেখে শ্রীঠাকুর আমাদের সকলের ওপর খুশী হলেন। সকলকে আশীর্বাদ করলেন।

আমাদের পূজা, প্রার্থনা, যজ্ঞ, কুমারী পূজা এসবের ফলে শ্রীঠাকুর কৃপা করে যেন কিছু সুস্থ হয়ে উঠলেন।

—:০:—

গান

শ্রীসরণাপুরী

মা তোর এ কেমন ধারা বল
মা হয়ে মা মায়ের বুকে
চালিস বাথার ছল।
ঘরে ঘরে মায়ের প্রাণ
কাঁদে দিবানিশি
ফুল বাগিচার ফুলগুলি যায়
একে একে খসি
মা গো তোর নয়নে জাগে নাকি
একটি ফোঁটা জল।
দেউলে তোর বলি দিতে
মা যদি কেউ রয়
নিবেদনের ডালা দিতে
যদি জাগে ভয়
বল কেমনে তোর অন্তরখানি
হবে মা উজল।

যে আঁধারে আছো তুমি

শ্রীসন্তোষ কুমার অধিকারী

যতক্ষণ বেঁচে থাই
ততক্ষণ আশা—তাকে পাবো।
ফুরোলে এ'চলা অন্ধকার,
হতাশার মৃত্যুর নির্জন।
বেদনায়, যন্ত্রণায় বিক্ষত হৃদয়ে তাই
ধরে রাখি আশা,
মৃত্যুকে এড়িয়ে যেতে হেঁটে যাই অন্তহীন পথে।

তবু পথে সন্ধ্যা নামে, ঘনায় আঁধার,
ফুরোয় তখন মনে শেষ স্পর্শ আশার ; সায়ম্
দু'চোখে ঘনায় অন্ধকার।

তখন বুকের কাছে কাণ পেতে শুনি,
ঘর তোমার কণ্ঠের।
সে কণ্ঠ আমায় ডাকে সব আলো মুছে চোখ থেকে
আঁধার সাগরে ডুবে যেতে,
যে আঁধারে আছো তুমি
অনন্তকালের পরিচিতে।

—:০:—

অঘটন ঘটনের অলৌকিক রহস্য—উড্‌ব্রুকের দীক্ষা

শ্রীসরেন্দ্র নারায়ণ বাগচী

(১) "তৎপদং দর্শিতং যেন।"

যিনি পরমপদকে জীবের নিকট প্রকাশ করেন তিনিই গুরু। যে যাহা নয় সে তাহা জানেনা ও জানাইতেও পারে না। সুতরাং যিনি পরমপদ স্বরূপ তিনিই গুরুতত্ত্ব। তিনি স্ব প্রকাশ বলিয়া নিজেকে সদাই জানেন ও পরপ্রকাশ বলিয়া জগতের কাছে প্রকাশ করেন। গুরু যখন পরমতত্ত্বকে পরের নিকট প্রকাশ করেন, পরকে আপন করিয়াই তাহা করেন। পর যখন গুরুর আপন হইল সে হইল শিষ্য বা গুরু কৃপা বা গুরু শক্তির অনুগ্রাহক। গুরুই "শ্রীগুরু" বা শক্তি বা "শ্রী" যুক্ত গুরু। শ্রী-গুরুই সিদ্ধ নরদেহে সদ্‌গুরু। তিনি ভগবদ্ শক্তির ধারক ও বাহক। তাঁহার চৈতন্যরূপী কৃপাশক্তি কোন অনুগ্রাহকের আধারে বীজরূপে পতিত হইলে ফল অবশ্যম্ভাবী। তাঁহার কৃপা শক্তিই অনুগ্রহীতের জ্ঞান নেত্র উন্মীলন করিয়া তাহার পরমার্থ দর্শন ঘটাইয়া দেয়। শ্রীগুরু-শক্তি সাক্ষাৎ ভগবদ্ শক্তি, তাহার গতি কেহই রোধ করিতে পারে না। অনুগ্রাহকের আধারে শ্রীগুরুর শক্তিপাত ক্রিয়ার ফলশ্রুতি ঘটার রহস্যাবৃত নানা অলৌকিক অঘটন ঘটে। অনুগ্রাহকের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও সাধনা দ্বারা গুরু কৃপা শক্তিকে ধারণ ও বহন করিবার জন্য যোগ্য অধিকারী হইতে হইবে।

শ্রীগুরুর জাগ্রত কুণ্ডলিনী বা চৈতন্যময়ী শক্তির প্রভাবে অনুগৃহীতের আধারে ঐ বীজ রূপী শক্তি আপনা আপনি বিকশিত হইতে থাকে। অনুগৃহীতের করণীয় হইল যে, গুরু শক্তিকে কঠোর সাধন সৌকর্যে পরিকর্ম রূপে নিয়ন্ত্রিত করা। উহা তাহার জ্ঞানোন্মেষের প্রতিবন্ধক অপসারণ করে ও আত্মস্ফুরণের অভিব্যক্তিকে সাহায্য করে। মহামহোপাধ্যায় আচার্য গোপীনাথ কবিরাজ বলেন "শিষ্যের যাবতীয় ক্রিয়া গুরু দত্ত বা গুরু কর্তৃক অভিব্যক্তিত চৈতন্য শক্তি বা কুণ্ডলিনী শক্তির সাহায্যেই হয়।"(১)

'শ্রীগুরু'ই সদ্‌গুরু ও যিনি সদ্‌গুরু তিনি ছাড়া অপর কেহই তাঁহার অনুগৃহীতের আত্ম চৈতন্যকে প্রকাশ করিয়া দিতে পারেন না। তাঁহার পূর্ণজ্ঞান শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি প্রভাব অনাদিকালের বদ্ধ জীবকে জাগাইয়া-দেয় ও তাহার জ্ঞান চক্ষুর পটল অপসারণ করিয়া তাহাকে শিবপদে স্থাপন করে। কবিরাজজীর মতে অতি উচ্চ অধিকারীর পক্ষে অবশ্য বাহ্য গুরুর প্রয়োজন হয় না, কিন্তু সাধারণতঃ ইহাই নিয়ম। উপরোক্ত শাস্ত্র কথা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যে সম্যক প্রমাণিত হয় তাহার নিদর্শন পাই একজন খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী, পাশ্চাত্য শিক্ষা, দীক্ষা ও পরিবেশে পুষ্ট খাঁটি ইংরাজের উক্তি হইতে। উক্তিটি প্রসঙ্গান্তরে প্রকাশ করিব।

ঐ সাধু ব্যক্তিটি তার জন (জর্জ) উডব্রুক ওরফে আর্থার এভালোন।

তন্ত্রাচার্য্য মহাযোগী শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের মহাপ্রয়াণের অব্যবহিত পরে, কলিকাতাস্থ নগরবাসীর পক্ষে একটি শোকসভা রসরাজ অমৃতলাল বসুর সভাপতিত্বে আহুত হয়। উড্‌ব্রুক বক্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। কিন্তু তিনি ভাষণ দিতে উঠিয়া পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালকের মত শুধু শোকাশ্রু পাত করিতে লাগিলেন। সভাপতি মহাশয়ের সমাপ্তি ভাষণের পর উডব্রুক একটি কাগজে নিম্নোদ্ধৃত কয়কটি পংক্তি লিখিয়া সভাপতি মহাশয়ের হাতে দিলেন—"একদা জীবনের পথের সন্ধানে ব্যাকুলচিত্তে দিশাহারা হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতে ছিলাম ও আকুলভাবে ভাবিতে ছিলাম, কে আমার প্রকৃত পথের সন্ধান দানে সমুন্নত সাধনার সোপান ধরাইয়া দিবে? যখন মর্ম্মে অনুভব করিতে ছিলাম জীবন্ত গুরুর অভাব, এবং কোথাও স্থির থাকিতে পারি নাই, ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে

(১) পত্রাবলী, ১ম খণ্ড—১২৫

প্রথম যিনি আমাকে পথ দেখাইয়া ছিলেন, যাঁহার দেবসঙ্গেরও বহু আকাঙ্ক্ষিত পূতঃ নির্মল সঙ্গস্পর্শে চঞ্চল ও নিরন্তিশয় ব্যাকুল চিত্ত শান্ত হইয়া আত্ম চৈতন্যের পথে গতি প্রাপ্ত হইয়া জীবনকে রক্ষা ও ধন্য করিয়াছিল, পুরুষোত্তম রাজরাজেশ্বর মদীয় গুরুদেব দেবমানব শিবচন্দ্রের পবিত্র চরণ সরোজে আমার সমস্ত প্রণতি ও শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করিতেছি। ওঁ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।২

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "এ জীবনে ঘটালে মোর অঘটনঘটার।" তোগী উত্তরক হইয়া গেলেন দিব্যাচারী কৌলজ যোগী, কিন্তু গূঢ়াবৃত।

এই অলৌকিক রহস্যাবৃত অঘটন ঘটনের কারণ কি? শ্রীঅরবিন্দ ভক্তযোগী দিলীপ রায়কে বলিতেছেন —The promised land of spirit begins from the frontiers of worldly enjoyments to start with.(৩)

ভোগের প্রান্তিক সীমা হইতেই যোগের প্রারম্ভিক আনুকূল্যের সূচনা। তন্ত্র বলে—"ভোগ যোগায়তে।" মহামহোপাধ্যায় কবিরাজজী বলেন, "ভোগ ও যোগের সামাবস্থাই জীবন্মুক্তি।" লীলাবাদে বিশ্বাসী যিনি, শ্রীঅরবিন্দের মতে তিনি তান্ত্রিক। তান্ত্রিক ব্রহ্ম সত্য বলে কিন্তু জগৎ মিথ্যা বলিয়া মানে না। শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ এ যুগে দুই সিদ্ধের সিদ্ধ তান্ত্রিক যোগী ও দুজনাই নিজেদের অধ্যাত্ম জীবনে প্রমাণ করিয়াছেন—"ব্রহ্ম সত্য ও তার জগত লীলাও সত্য"। গুরু যখন 'শ্রী'যুক্ত, তিনি তখন ঐ 'শ্রী'র সহায়ে লীলা করেন।

লীলা শক্তি কেন্দ্রিক। শক্তি কি? "The one original transcendent shakti the Mother bears in her eternal consciousness of the Supreme Divine".(৪)

বিশ্বোত্তীর্ণ পূর্ণ আদ্যা পরাশক্তিই মা, যিনি পরম শিবের অনাদি অনন্ত চৈতন্যশক্তিকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ আবার বলিতেছেন,—"Each of the worlds is nothing but one play of Mahasakti of the system of worlds or universe, who is there as cosmic soul and personality of the transcendent Mother".(৫) প্রতিটি জগৎ বিশ্বাত্মিকা বিশ্বেশ্বরীর শক্তির লীলা বই আর কিছু নয়। বিশ্বে ঐ মহাশক্তি আদ্যা পরাশক্তির আত্মা ও মূর্তি।

পরাশক্তি ও বিশ্বাত্মিকা মহাশক্তির ব্যষ্টিরূপে লীলার স্বরূপ বলিতেছেন শ্রীঅরবিন্দ—"Individual, She embodies the powers of the two vaster ways of her existence, and makes them living and near to us and mediates between the human personality and Divine Nature"(৬)

বিশ্বাতীত পরাশক্তি ও বিশ্বাত্মিকা মহাশক্তি জীবহৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ব্যষ্টিরূপে জীবহৃদয়বাসিনী খণ্ডশক্তি। মা, বিশ্বাতীতা পরাশক্তি ও তাঁহার বিশ্বাত্মিকা মহাশক্তি দ্বারা সৃষ্টির রূপদান করেন, উভয়কে জৈবব্যবহারে সন্নিহিত করেন এবং মনুষ্য ও ভগবদ্‌শক্তির মধ্যে মধ্যস্থতা করেন।

---

(২) 'তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব' গ্রন্থের ১০৯ পৃ। ঐ বইখানির লেখক অধুনা স্বর্গত পণ্ডিত বসন্তকুমার পাল। রাণাঘাটে রাণী কলোনীতে বাস করিতেন। উত্তরকের গুরুভাই। ১৯৬৩ সালে রাণাঘাটে একাধিক বার পাল মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ আলোচনাকালে শিবচন্দ্র ও উত্তরক বিষয়ে নানা তথ্য জানিয়াছিলাম।

(৩) দিলীপ রায়—'Among the Great' মহাজন সান্নিধ্যে—২১৩

(৪) The Mother—শ্রীঅরবিন্দ, মহামায়া মা—২৮

(৫) ঐ ঐ —৩০

(৬) The Mother. 27-28 ; মা মহামায়া—২৭-২৮

মহাশক্তির লীলার স্বরূপ বলিতেছেন মহামহোপাধ্যায় কবিরাজজী—তিনি নিজের যাবতীয় শক্তি ও রূপ প্রকট করেন, উদ্দেশ্য হস্তক্ষেপ করা, পালন করা, সংহার করা, ধ্বংস করা, যুগের পরিবর্তন করা, শক্তিপুঞ্জের ব্যষ্টি ও সমষ্টির দ্বারা প্রবাহে সকলকে সঞ্চালন করা।"(৭)

লীলাবাদ রহস্যাবৃত। আপাতিক সীমিত বিচার বুদ্ধি দ্বারা লীলাবাদের আধ্যাত্মিক রহস্য অনুমেয়। যতক্ষণ অন্তর্জগতে প্রবিষ্ট না হওয়া যায়, ততক্ষণ রহস্যের সমাধান সম্ভবপর নহে। শ্রীঅরবিন্দ তাই বলিতেছেন—

Who shall pierce into cryptic gulf
And learn what deep necessity of the soul
Determined casual deed and consequence ?
Absorbed in a routine duty of daily acts
Our eyes fixed on external scene,
We hear the crash of wheels of circumstance
And wonder at the hidden cause of things(৮)

কে এই রহস্যাবৃত অতলের গভীরে ডুবিয়া জানিতে পারে কোন্ বিশেষ প্রয়োজনে পরম স্বরূপ অনন্তাবিভূপূর্ব লীলার মাধ্যমে অঘটনটি ঘটাইলেন কেন ? প্রাত্যহিক গতানুগতিক কাজে লিপ্ত মন বহির্বিশ্বের দৃশ্যপটে সদাই সন্নিবিষ্ট। ঘটনাচক্রের আকস্মিক সঙ্ঘর্ষের অভিঘাতে মনে জাগে বিস্ময়। মন শুধু ভাবে এই অঘটন ঘটনের গূঢ় কারণ কি। শাস্ত্র বলে যে, মহামায়ার শক্তির অনন্ত বিভূতির মধ্যে যোগমায়াশক্তির বিভূতিই নানা অঘটন ঘটনের ঘটক। সিদ্ধ নরদেহকে আশ্রয় করিয়া ভগবানের করুণা শক্তির নানা বিভূতির লীলা চলে। সদ্‌গুরুই সিদ্ধ নরদেহে ভগবদ্‌শক্তির নানা বিভূতির ধারক বাহক ও প্রযোজক। তিনি "মনোজবীত্ব" বিভূতির সহায়ে অনুগৃহীতের অন্তর্জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার "যত্র কাম বশীত্ব" বিভূতির ক্রিয়াশীলতার মাধ্যমে অনুগৃহীতের অন্তর ও বহির্সত্তাকে আমূল পরিবর্তন করেন তাহাকে তাঁহার সমভাবাপন্ন করিবার সহজে। যদি কোন যোগ্য আধারে সদ্‌গুরুর কৃপাশক্তি বা শক্তিপাত ক্রিয়ার (দীক্ষার) সূচনা হয় ও ঐ অধিকারীর গুরুশক্তি ও স্বীয় সাধন শক্তি সহায়ে সাধনায় ক্রমিক পারঙ্গমতা জন্মে, তাহা হইলে সেই অনুগৃহীতের জীবনে অনন্তাবিভূপূর্ব অলৌকিক অঘটন ঘটনের সোতাযাত্রা দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক হইতে হয়।

শ্রীগুরু ভট্টাচার্য মহাযোগী শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব গৃহাবৃত কিন্তু পূর্ব হইতেই জানেন যে, কলিকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি তাঁর জন্য উত্তরক কি আধার, অধিকার, সংস্কার ও আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি লইয়া জগতে আসিয়াছেন। তিনি ঐ দুই ধর্মাবলম্বীকে শাক্ত অদ্বৈতবাদে দীক্ষিত করিবেন বলিয়া উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় আছেন। কখন, কিভাবে, কোন পরিবেশে ঐ সময় আসিল ও শিবচন্দ্র উত্তরককে আপন করিয়া লইয়া উত্তরকের এই জীবনেই অলৌকিক রহস্যাবৃত অঘটন ঘটনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার অন্তরঙ্গতার ঘটাইলেন, তাহার বিবরণ যতটা সংগ্রহ করিয়াছি তাহাই নিবেদন করিব। আমার সীমিত জ্ঞান ও বুদ্ধি সহায়ে শিবচন্দ্র ও উত্তরককে জানিয়াছি এযুগে "শক্তি-শাক্ত"-র মূর্ত প্রকাশ রূপে।

---

(৭) পত্রাবলী ১ম খঃ, ১৫৭-১৫৮

(৮) সাবিত্রী—৪২

(ক্রমশঃ)

ভাবমুখে কথামৃত

স্বামী বোধানন্দ

যুগতীর্থ দক্ষিণেশ্বর। সম্মুখে বিস্তীর্ণ গঙ্গা বিপুল তরঙ্গ হিল্লোল বুকে নিয়ে ছুটে চলেছে সাগরের পানে। তার উদার ছন্দে আবিষ্ট হয়ে বসে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বিশ্বজনের অনন্ত ভাবরাশি বিশাল বক্ষে ধারণ ক'রে ব'সে আছেন তিনি। ...কখনো সহজ সমাধিচারী অলোক সুন্দর পুরুষ। কখনো ভাবসিন্ধুর তরঙ্গে উচ্ছল—লীলারসে পরপর তনু; চলেছেন তাঁর আবরিণী শ্যামা-মায়ের মন্দিরে। কখনো আবার সহজ ভাবের এক আশ্চর্য্য মানুষ। বসে আছেন পঞ্চবটীর ছায়াশীতিরা বটের বেদীতে; সঙ্গে অন্তরঙ্গ সঙ্গীদল। আপন মনে বলেন তাঁর ভাবের কথা—মহাভাব ঈশ্বরের ভাব: এ ভাবে ছিলাম আমি। সাধন করেছি আমি শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ভাবে। তারপর সত্তা আমার যখন ছুটে চলেছে অসীমের পানে—স্বরূপ অবাক্‌লোকে—ভাবাতীত দেশে, তখন মন্দিরে আমার চিন্ময়ী মা ভবতারিণী—ত্রিনয়নী ভাবসঞ্চারিণী ভিনবার আমায় বলেন—ওরে, তুই ভাবমুখে থাক্।

ভাবমুখে তাঁর কথার অমৃতধারা। সে যে তাঁর মায়েরই 'রাশ ঠেলে' দেওয়া। মাতৃবাণী ভাবমুখে ব'সে তিনি কত তর্কপন্থী পণ্ডিত আর ধর্মজিজ্ঞাসুদের শাস্ত্র আলোচনা শোনেন, কিন্তু বলেন—'আমি মায়ের মুখের কথার সঙ্গে না মিললে কিছু লই না।' ...এক কথায়—বিশ্বজননীর ভাবমূর্ত্তিতাকার শ্রীরামকৃষ্ণ। কাশীপুর উদ্যানবাটিতে তাঁর তিরোধানের অব্যবহিত পরে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী আকুল ক্রন্দনে চীৎকার ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদ্দেশে বলে উঠেছিলেন—'ও মা কালী গো! তুই আমার ছেড়ে কোথায় গেলি গো।' আর স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—'ভগবান বল, অবতার বল, রামকৃষ্ণ ছিলেন আমাদের মা।' ...বরং মহাকালী এ যুগে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে আমাদের কাছে এসে পাশে ব'সে কথা বলে গেলেন। সেইজন্য তাঁর ভাবমুখে যাকে যেমন তাকে তেমন, যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে ঠিক তেমন ভাবের কথাগুলি অপূর্ব সহজতায় মানুষের কানের ভিতর দিয়ে মর্মে প্রবেশ করে। সেইজন্যই তাঁর মধুর সরল কথায় কত পণ্ডিতের শুষ্ক হৃদয় চন্দনের স্নিগ্ধতায় ভরে ওঠে; কত মত আর পথের সাধক অযাচিত সন্ধান পেলে ভক্তির মতো ধ্রুবী নক্ষত্রের জলপেরে, সাধনসমুদ্রের অতল গভীরে ডুবদেন

একাধারে মা আর ছেলে। কখনো তিনি মাতৃভাব-মণ্ডিত। আবার কখনো মায়ের আলোয় ঝলমল। ছেলের মুখে মায়ের মুখের আলো। সেই আলোতে কত সুন্দর জীবনে জ্বলে উঠেছে জ্যোতির দীপালিকা, আবার কত ম্লান জীবনদীপে তন্দ্রাশিখা। .....তিনি এলেন কিন্তু আমাদেরই মতো সাধারণ মানুষের বেশে। সকল জনের মনের মানুষ হলেন। তাই ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন—'আধুনিককালে তিনিই (শ্রীরামকৃষ্ণ) বিশ্বমানব—সর্বাঙ্গত—সার্বজনীন মনের অধিকারী। আশ্চর্য্যের বিষয় হ'ল তাঁর চরিত্রের বহুমুখিতা: এ ক্রমবিকাশের স্তরগুলি, যার ফলে প্রতি মানুষের মনের সমস্যার কথা তিনি বুঝতে পারতেন, যেন সেগুলি তাঁর নিজেরই সমস্যা।' ...সমাজের সকল স্তরের মানুষের শুধু কাছে আসা নয়, একেবারে তাদের হৃদয় মাঝেই ঠাঁই পাতলেন তিনি। কত দুঃখ দৈন্যাহত লাঞ্ছিত মানুষ শুনল তাদের প্রাণের পরম কথা, পেল সান্ত্বনা আর শান্তি, পেল জীবনে চলার পথে পরম পাথেয়। তাই ধরণী শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে বলেছেন পাশ্চাত্যের মনীষি জীন হার্বার্ট—'Sayings of Sree Ramkrishna can cater to the wants of peasants workmen shepherds, mountaineers etc'.—শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী কৃষক, মজুর, মেষপালক, পর্বতারোহণকারী সকলেরই অভাব পূরণ করতে পারে।

…এই যুগগুরু পুরুষের ভাববাণী দক্ষিণেশ্বরের আকাশ হ'তে আজ দিকে দিকে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। এই মহাগ্রন্থ বিশ্বজনীন ভাবাদর্শের এক অপূর্ব নির্দেশ নামা। এই গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিটি বাণী তাঁর ভাবময় জীবনের প্রদীপ্ত শিখা। যুগের অন্ধকার সমুদ্রে এক আলোকস্তম্ভ। এই আলোকস্তম্ভ ভারতের যুগযুগ লালিত লৌকাচার, যুগমাচার, বেদ-বিধানের। সেই বিধান যুগপ্রয়োজনে নূতন হয়ে সাজিয়ে দিয়েছে এই এক্‌টি গ্রন্থ। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের অভিনব অনুভূত নির্দেশনায় তাঁর অমৃত কথা যাঁর অমর লেখনী হতে নিঃসৃত হয়েছে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীম—মাষ্টার মশায়—মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। সন্ধ্যাই এক গুপ্ত যোগীর দেখা আমরা পাই, যাঁর অন্তরে অহরহ রামকৃষ্ণ-নামাবলী, আর ভাবমুখী মনে রামকৃষ্ণ লীলাদৃশ্যের অপূর্ব সঞ্চয়ন। সে যুগের একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আদর্শ শিক্ষাবিদ তিনি। তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত গ্রন্থ সম্বন্ধে এযুগের অন্যান্য আকাশের মহাজ্যোতিষ্ক শ্রীসত্যানন্দদেব বলেছেন—'কথামৃত ভাগবৎ এযুগে পরম শাস্ত্র—শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা—ভাগবৎ-ভক্ত-ভগবান তিনে এক একে তিন। এ যুগের পঞ্চম বেদ। কথামৃতের কল্পলতায় আজ ধরণী অমৃতায়িত। আজ দিকে দিকে দেশে দেশে, নানা ভাষায়, নানা ছন্দে শ্রীঠাকুর মূর্ত হয়ে ওঠেন কথামৃতের রসায়নে। …কথামৃত আজ বিশ্বের বাইবেল ব'লে গণ্য হতে চলেছে। বিশ্বের বহু প্রধান প্রধান সব জাতির, সব ধর্মের কথাই এতে রয়েছে। অনুবাদ সাহিত্য হিসাবে আজ প্রায় সব প্রধান প্রধান ভাষায় এর স্থান অবিসংবাদী।' সংস্কৃত, হিন্দী, ইংরাজী, ফরাসী, রাশিয়ান, স্প্যানিশ, জার্মান, পোর্তুগীজ, চেকোশ্লোভাক প্রভৃতি বহু ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। 'কথামৃত শুধু সাধুদের জন্যেই ত নয়, সব নিয়ে কথামৃত একটি কাব্য বিশেষ। তিনি যে কবি যুগে যুগে।' —বলেছেন একথা মরমী কবি শ্রীসত্যানন্দদেব। …কথামৃতের পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের কথা অপূর্ব লেখনীস্পর্শে এঁকেছেন বিশ্বের বাণী মন্দিরের একনিষ্ঠ পূজারী—এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষি রোমাঁ রোলাঁ—'It is always the same Book. It is always the same Man – the son of Man, the Eternal, our son, our God reborn. With each return He reveals himself a little more and fully and more enriched by the universe'. —অর্থাৎ, সর্বকালের এই একই মহাগ্রন্থ। শাশ্বত এই একই মহামানব—মানবসিস্তররূপে—আমাদের ঈশ্বরের পুনরাবির্ভাব। যুগে যুগে এই বিশ্বে পূর্ব হ'তে পূর্বতর রূপে তাঁর মহান্ অভ্যুদয়। …সুদূর ফরাসী দেশ হ'তে মহামনীষি রোমাঁরোলাঁ পত্রযোগে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর তথ্য ও তত্ত্ব প্রসঙ্গে অন্তরের অন্তরতম দেশ হ'তে গভীর শ্রদ্ধায় কত পরিপ্রশ্ন করছেন—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ – বিশ্বব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তৎকালীন অধ্যক্ষ মহাপুরুষ শিবানন্দ স্বামীর কাছে। যুগের যাযাবর ঘুচিয়ে—রোমান ক্যাথলিক পরিবারের এই খৃষ্টানভক্ত রোলাঁ আকুল অনুসন্ধিৎসা নিয়ে কত তত্ত্বজিজ্ঞাসা করেছেন কথামৃতের ঋষি শ্রীম-র কাছে।

আজ এই কথামৃত-ভাগবৎকারের কথাতেই শ্রীপ্রভুর লীলাকাহিনী একটুখানি বলবো, কেমন করে কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে সেদিন এক অচিন্ পুরুষ মোহন হাসি হেসে পণ্ডিতের অঙ্গন দ্বারে দেখা দিয়েছিলেন।—

প্রথম দৃশ্য

[কলিকাতা—বিদ্যাসাগরের বাটি– ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগর]

(শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ৩য় ভাগ)

শ্রীরামকৃষ্ণ—আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল বিল, ক্ষুদ্র নদী দেখেছি, এইবার সাগর দেখছি।

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)—তবে নোনাজল খানিকটা নিয়ে যাও।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না গো। নোনা জল কেন? তুমি

অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর। তুমি যে ক্ষীর সমুদ্র (সকলের হাস্য)···আর সিদ্ধ তো তুমি আছই।

বিদ্যাসাগর—মহাশয় কেমন ক'রে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—আলুপটল সিদ্ধ হ'লে তো নরম হয়, তা তুমি তো খুব নরম। তোমার জন্য দয়া।

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)—কলাই মাষ্টার সিদ্ধ তো শক্তই হয় (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি তা নওগো।···সকুনি খুব উঁচুতে ওঠে, তার নজর ভাগাড়ে, যারা শুধু পণ্ডিত শুনেছি পণ্ডিত, কিন্তু তাদের কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি, সকুনির মত পচা মরা খুঁজছে। আসক্তি অবিদ্যার সংসারে। দয়া, ভক্তি, বৈরাগ্য বিদ্যার ঐশ্বর্য।···

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে বিদ্যাসাগরের প্রতি)—এই যা' বল্লুম, বলা বাহুল্য, আপনি সব জানেন—তবে খপর নাই (সকলের হাস্য)। কল্পতরুর ভাণ্ডারে কত কি রত্ন আছে। কল্পতরু রাজার খপর নাই।···একবার বাগান দেখতে যাবেন, রাসমণির বাগান। তাতি চমৎকার জায়গা।

বিদ্যাসাগর—যাবো বই কি। আপনি এলেন আর আমি যাবো না?

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার কাছে? ছি! ছি!

বিদ্যাসাগর—সে কি। এমন কথা বল্লেন কেন? আমায় বুঝিয়ে দিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আমরা জেলে ডিঙি (সকলের হাস্য)। খাল বিল আবার বড় নদীতেও যেতে পারি। কিন্তু আপনি জাহাজ, কি জানি যেতে দিতে ঠেকার পাছে লেগে যায় (সকলের হাস্য)।

বিদ্যাসাগর সহাস্যবদন, চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর হাসিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তার মধ্যে এ সময় জাহাজও যেতে পারে।

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)—হাঁ এটা বর্ষাকাল বটে। (সকলের হাস্য)।

মাষ্টার (স্বগতঃ)—নবানুরাগের বর্ষা, নবানুরাগের সময় মান অপমান বোধ থাকে না বটে।···

[বিদায়

বিদায় মুহূর্তে—দক্ষিণেশ্বরের এই বিদ্যাপুরুষ সে যুগের এক দিকপালের সম্মুখে দাঁড়িয়ে শ্রীকরে জপ করতে করতে ভাবাবিষ্ট হলেন। বুঝি বিদ্যাসাগরের পারমার্থিক কল্যাণে জগজ্জননীর কাছে প্রার্থনা করলেন।···

মহাপ্রাণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে এই প্রথম সাক্ষাৎকারের কয়েকদিন পরে শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে মাষ্টার মহাশয়কে বলেছিলেন—'আর হু' একবার ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে দেখার প্রয়োজন। ছালচিত্র একবার মোটামুটি এঁকে নিয়ে তারপর বসে বসে রঙ ফলান। প্রতিমা প্রথম এক মেটে, তারপর দো' মেটে, তারপর খড়ি, তারপর রং—পরে পরে করতে হয়। ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের সব প্রস্তুত, কেবল চাপা রয়েছে। কতকগুলি সৎ কাজ করছে,—কিন্তু অন্তরে কি আছে, তা জানে না, অন্তরে দোপো চাপা রয়েছে। অন্তরে ঈশ্বর আছেন,—জানতে পারলে সব কাজ ছেড়ে ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে ইচ্ছা হয়।'—দরদী শ্রীরামকৃষ্ণ তাই প্রথম আলাপের দিনেই আহ্বান করলেন বিদ্যাসাগরকে; দক্ষিণেশ্বরে যাবার নিমন্ত্রণ করলেন। বিদ্যাসাগর সেই ডাকে সাড়া দিলেন; শ্রীরামকৃষ্ণের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন, কিন্তু রক্ষা করতে পারলেন না।···শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বিদ্যাসাগরের প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান স্কুলের প্রধান শিক্ষক—অন্তরঙ্গ ভক্ত মাষ্টার মহাশয়কে বলেছিলেন দুঃখ অভিমান করে—হ্যাগা, বিদ্যাসাগর বলল, এখানে আসবে, কিন্তু এলো না।···বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য আছে, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি নাই।'

দয়ার সাগর, বিদ্যার সাগর ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের শেষ অধ্যায়টি ছিল বড়ই বেদনাদায়ক, করুণ অশান্তিকর। তাই বোধ করি অন্তর্যামী শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের অন্তরে পরম শান্তির স্পর্শটুকু দেবার জন্য উন্মুখ হয়েছিলেন।·····

বিদ্যা সিন্ধুর মোহন হাসি হেসে ঠাকুর সেদিন বিদ্যাসাগরের কাছে এসে জিজ্ঞেসছিলেন—'আচ্ছা তোমার কি ভাব?' বিদ্যাসাগর মৃদু হেসে বলেছিলেন রামকৃষ্ণকে —'আচ্ছা সে কথা আপনাকে একলা একলা একদিন বলবো।'...তারপর কতদিন কেটে গেল। কোন দিনই আর আসা হল না। বলা হল না ঠাকুরকে বিদ্যাসাগরের ভাব জলাবের কথা : . ...

ভবের হাটে এক নূতন ভাব-পসারী এসেছিলেন। বিনামূল্যের ভাব-বেসাতী তাঁর। দর উঠার করে দিতে এসেছিলেন। শুধু চেয়েছিলেন অন্তরের একটু আকুতি।...

• • • •

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কলিকাতা—শ্রীযুক্ত অধরলাল সেনের বাড়ী—ভক্ত সঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্কিমচন্দ্র]

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৫ম ভাগ)

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—বঙ্কিম। তুমি আমার কার ভাবে বাঁকা গো।

বঙ্কিম (হাসিতে হাসিতে)—আর মহাশয়। জুতোর চোটে (সকলের হাস্য)। সাহেবের জুতোর চোটে বাঁকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না গো, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে বঙ্কিম হয়েছিলেন। শ্রীমতীর প্রেমে ত্রিভঙ্গ হয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, আপনি কি বল, মানুষের কর্তব্য কি?

বঙ্কিম (হাসিতে হাসিতে)—আজ্ঞে, তা যদি বলেন, তাহলে—আহার, নিদ্রা মৈথুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)—এঃ! তুমি যা রাতদিন কর তাই তোমার মুখে বেরুচ্ছে। লোকে যা খায় তার ঢেকুর ওঠে। কেবল কামিনী কাঞ্চনের ভিতর রাতদিন রয়েছো। আর ঐ কথাই মুখ দে বেরুচ্ছে। কেবল বিষয় চিন্তা করলে পাটোয়ারী স্বভাব হয়। ঈশ্বরচিন্তা করলে সরল হয়। ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হলে ও কথা কেউ বলবে না।

কেউ কেউ মনে করে এরা কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর করছে, পাগল। এরা যেহেতু হয়েছে। আমরা কেমন খাচ্ছি, কেমন দুধভোগ করছি; টাকা, মান, ইন্দ্রিয় সুখ। কাক মনে করে, আমি বড় খাচ্ছি, কিন্তু সকালবেলা উঠেই পরের ও খেয়ে মরে। কাক দেখো না, কত উড়ুর পুড়ুর করে, তাই খাচ্ছি। (সকলে স্তব্ধ)। ...(বঙ্কিমের প্রতি কোমল ভাবে)—আপনি কিছু মনে কোর না।

বঙ্কিম—আজ্ঞে, মিষ্টি শুনতে আসিনি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাই বলছি দুধ খাও। কিন্তু জল নাই। দুধলে অমর হয় [বিদায়]

বাংলার নবজাগরণ যুগের—'রেনেসাঁস'-এর অন্যতম চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র। 'বন্দেমাতরম্'-মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র।—এই বঙ্কিমচন্দ্রকে সচ্চিদানন্দের অমৃতসাগরে ডুব দিতে বলেন জ্ঞানসিন্ধু গদাধর, যিনি গ্রাম্য পাঠশালার অসম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রাপ্ত এক ব্রাহ্মণ সন্তান। যিনি নিজের নামের সঙ্গে গ্রামের ঠিকানাটিও ঠিকমতো লিখতে জানতেন না। কিন্তু তাঁর পরম উপলব্ধির বাণী অন্তরের অন্তরতম দেশে প্রবেশ ক'রে বঙ্কিমকে উন্মনা করলো।...শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম ক'রে আস্তে আস্তে তিনি বিদায় নিলেন।

কিন্তু দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে রইলেন। একমনে কি যেন ভাবছেন। চাদরখানি তাঁর কাঁধে নেই। গায়ে শুধু জামা। অনেক শুক্ত তাড়াতাড়ি চাদরটি কুড়িয়ে নিয়ে আনমনা বঙ্কিমের হাতে দিলেন।...

• • •

বিশ্বজননীর আলোর দুলাল গদাধর সুন্দর অভিমান-মধুর ভঙ্গিমায় বলতেন—আমি নিরক্ষর লোক, অক্ষর জানি। তাঁর 'লরেন' বুদ্ধি বলে তিনি বুঝা।...পরক্ষণেই আবো হাসিতে শ্রীমুখখানি চলচল হয়ে উঠল। আত্মবিশ্বাসী শ্যামাসাধকের গরবে দুলে উঠল বুক। মাতৃমহিমায় বিভোর হয়ে গাইলেন—

'পরমধন সে পরমমণি
যা' চাবি তাই দিতে পারে।

কত মণি পড়ে আছে
আমার চিন্তামণির নাচ দুয়ারে।'

আনন্দের পূর্ণঘট হৃদয়ে ধারণ ক'রে বসে আছেন। বসে আছেন ভাবমুখে—মহামণি হয়ে—পণ্ডিত সভা আলো ক'রে।...আত্মারাম পুরুষের শ্রীমুখে শিশুর সারল্য। তাঁর আত্মার সারলো সত্য, প্রেম আর সৌন্দর্য্য হয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত। বিশ্বের সব ধর্মগ্রন্থের সকল গ্রন্থি হয়েছে উন্মোচিত। পণ্ডিতমাশীর যুক্তি ভাল হয়েছে ছিন্ন। মুখর ধর্মবক্তা হয়েছেন নীরব। তাঁরা মুগ্ধ বিস্ময়ে শুধু দর্শন করছেন দক্ষিণেশ্বরের এই আশ্চর্য্য পুরুষকে।...

তাইতো ঠাকুরের আদরের 'নরেন' একদিন বিবেকানন্দ হয়ে বলেছিলেন—'শিঙ্গকেরা চুপ করুক, বইগুলোও নিস্তব্ধ হোক ; আমার আত্মার মধ্যে কেবল বিঘোষিত হোক তোমার বাণী।'

—০—

কাঠুরের আত্মবিলাপ

আনিস সাত্তার

'পরের কাষ্ঠাহরণ করা যাহার স্বভাব,
সে পুনর্বার কাষ্ঠাহরণে যাইবে।'

—বঙ্কিমচন্দ্র

আমাকে কাঠুরে ভেবে
প্রত্যহ বিদ্রূপ করে চলে যাও চপল স্বভাবে।
কেননে বোঝাই বলো
কাঠ কাটা নয় কোনও ঘৃণ্য অপরাধ।
বিপদে দুঃখের ভার
কাঁধে ক'রে তুলে নেওয়া
জীবনে আছিলো শুধু এইটুকু সাধ।

আমি তো সবার দুঃখে
সব কিছু ভুলে
সাগর মন্থনে একা নেমেছি হেলায়।
কেটেছি অনেক কাঠ
অরণ্যে ভীষণ ;
বিনিময়ে তার কেবল পেয়েছি ঘৃণা ;
তাইনি তখন
ফিরে এসে প্রতীক্ষিত কাকেও দেখবো না

আজও আমি কাঠ কাটি
সব কিছু ভুলে,
যখন বিপন্ন মাঝি ঝঞ্ঝার উদ্দাম সলিলে
নিরন্ন মৃত্যুর মুখে—
আমি দ্রুত চলে যাই অরণ্য গভীরে
দিয়ে রেখে নদী,
কাঠুরে যে কাঠ কাটে
সমস্ত বিপদ ভুলে স্থিরচিত্তে আমি নিরবধি।

—:—

তৃষ্ণা

সুধেন্দু মল্লিক

তাকে পাবি ওকে মেঘ আর দেরী নয়
দু'রোরে আঘাত করে যায় যে সময়।
হে নিভৃত হে বাঞ্ছিত হে সহসা আগন্তুক
তুলসীর বুক ভরা স্মৃতি চন্দন।
হরি পরিমণ্ডল অভিলাষী মন।

কি দেব বা কি দেব না তুলি ফেলে রাখি
যে কথার মানে নেই তাই বলে ডাকি।
হাসিতে ও বারাপাতে সমধুর বেদনাতে
প্রিয় গানে প্রিয় সুর মথিত ভুবন।
হরি পরিমণ্ডল অভিলাষী মন।

আর ভুল হয় নাকি আর হতে পারে?
ধরো যদি তবু হয়, যায় হতে যারে
তবে যাবে ভারহীন শুভ্রনে নতোলীন
মতো দিনে পাই কের হৃদয়ের ধন।
হরি পরিমণ্ডল অভিলাষী মন।

ধূলোর পড়াই আমি স্মিত ছুটে যাই
পথের পাথের দেহ দুহাতে জড়াই।
সে যেন সিতার মতো লাবণিতে চিরায়ত
ব্যাকুল বাতাসময় নিশার স্বপন।
হরি পরিমণ্ডল অভিলাষী মন।

কিছুই হলো না বলা কথা হলে শেষ
দুটি পলকের মাঝে জাগে অনিমেষ।
আঁধারের নীরবতা আলোকের মুখরতা
একাকার হয়ে যায় গ্রহণ হরণ।
হরি পরিমণ্ডল অভিলাষী মন।

—:০:—

সেই সত্য সেই ধ্রুবলোক

রণজিৎ কুমার সেন

এক সত্তা চিরদিন ধ্রুবতারা হয়ে
আমারে যায় যে লয়ে
তমসার পঙ্ক থেকে আলোকের তীরে;
সে সত্তা ঈশ্বর হয়ে দিবা-রজনীরে
জ্যোতিষ্মান ক'রে রাখে সর্ব দেহে-মনে।

কোনো ক্ষণে
অকস্মাৎ ডুবি যদি ভুলের সাগরে,
সাগরে সে নিয়ে আসে হাত ধ'রে
সোভাষীপ্ত নাটমঞ্চে তার;
চেয়ে দেখি এ জগৎ এই সংসার
সবই সেই সত্যময়, সব কিছু তার।

অন্ধ যারা মিথ্যা ভাবে,
মনে করে দিন যাবে
বিত্তের বৃত্তে ব'সে,
দেখে না সে অকস্মাৎ কবে খসে
ধ্রুবচিত্ত হ'তে কোন্ তারা।
মুহূর্তেই অন্ধকারে হয় দিশাহারা।

অবিবেকী ধর্মদ্বেষি যত
পাপে থাকে রত;
জানে না যে প্রাণকোষে যেথায় আলোক,
সেই সত্তা, সেই ধ্রুবলোক।
নিত্য অবিরাম
তারেই ঈশ্বর ব'লে জানাই প্রণাম।

॥ শ্রীচৈতন্য, বঙ্গসংস্কৃতিতে সত্যাগ্রহী চেতনা ॥

মনকুমার সেন

কী প্রবল সত্যাগ্রহী চেতনা সঞ্চারিত করে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বঙ্গসংস্কৃতির অন্তরাত্মার ঘটিয়েছিলেন ভাবলে স্তম্ভিত হতে হয়। আর চার বৎসরের মধ্যে এই মহাজন্মের পাঁচশত বৎসর পূর্ণ হবে। প্রেমাভক্তির এক অভাবনীয় প্রয়োগশক্তি সেদিন প্রথমে গৌড়বঙ্গের ও পরে নীলাচল ক্ষেত্রের পুঞ্জীভূত জঞ্জালকে গঙ্গাজলে পরিণত করেছিল; বর্ণকৌলিন্যের কুটিলতা ও আভিজাত্যের বিদ্রূপ, রাজকোষ ও রাজরোষের দাবী পূরণে প্রাণান্ত জনসাধারণকে মানুষের সর্বোচ্চ মর্যাদায় আলিঙ্গন করেছিল; সংগঠিত ত্যাগের শক্তিতে অন্যায়ের মোকাবিলা করে ন্যায়ধর্মের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। প্রেম ও অভয়ই যে গৌড়বঙ্গের বীজমন্ত্র ও বঙ্গসংস্কৃতির ধর্মস্বরূপ তাকে প্রাধান্য করে তুলেছিল। আজকের সামাজিক পরিস্থিতিতে তার অন্তর্মুখী মূল্যায়নের অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সমাজের মূল প্রশ্নসমূহের মুখোমুখি হয়ে সমাজেরই চেতনাকে তার সমাধানে তৎপর ও অর্থবহ প্রয়োগের এমন ঘটনা বিশ্বের কোথাও কি এর আগে ঘটেছে?

প্রথাবদ্ধ সমাজের যুক্তিহীন বিধিবিধানের জট-পট, সমাজবিমুখ আত্মসর্বস্ব পাণ্ডিত্যের অভিমান, রাজার তাঁবেদারীতে কৃতকৃতার্থ উচ্চবর্ণের নীচমনস্কতা, এবং নীতিপন্থ প্রচার ও জীবনগত আচরণের মধ্যে আকাশ পাতাল দূরত্বের কপটতা ও কলঙ্ক সেদিনের যে সমাজকে করেছিল বিভ্রান্ত ও বিবশ, তাকে প্রেম ও অভয়ের মাঙ্গলী পরিধেয়ে নীচুতলার মানুষের হাতে জীবনসংগ্রামের অব্যর্থ হাতিয়ার রূপে সত্যাগ্রহকে তুলে দিয়েছিলেন যিনি, তিনিই আমাদের মহাপ্রভু, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, বিশ্বম্ভর, শ্রীগৌরাঙ্গ, সুহৃদ-সখার গোরা, স্নেহময়ী মায়ের দুলাল প্রাণাধিক 'নিমাইচাঁদ'।

পুণ্যভূমি ভারতের পূর্বাচলে নদীয়ার আকাশে যে চাঁদ উঠল তারি আলোর বন্যা চারিশত বৎসর পরে পশ্চিম উপকূলের পোরবন্দরে আর-এক মোহনমূর্তিতে তুলনারহিত ভঙ্গিতে এই সত্যাগ্রহীশক্তিকে কোটিজনের জীবনে সঞ্চারিত করল; গৌড়বঙ্গের নবদ্বীপ আর উৎকলের মধ্যে চোদ্দশতাব্দীর সেতুবন্ধ বঙ্গসংস্কৃতিকে এক আশ্চর্য মাত্রার মহিমায় প্রসন্ন করে তুলল। —অধ্যাত্মশক্তির কী বিচিত্র প্রকাশ! কত অসম্ভব তার অভিব্যক্তি! আবার শ্রীকৃষ্ণচেতনা মনকুবের পাশ্চাত্যকেই উদ্বেলিত করে তুলছে, দুঃসাধ্য কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্য দিয়ে হাজার হাজার ক্লান্ত মানুষ সাগরপাড়ি দিয়ে এসে লুটিয়ে পড়ছে ভারতের পুণ্যভূমিতে। মায়াপুরের চন্দ্রোদয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের স্তনন্ধয়-ধবিত এক পরম প্রার্থিত একাত্মতার মধ্যে যুগান্তরের লক্ষণ সুস্পষ্ট।

তবু বলব—'এই যাত্র।' ভক্তের সংখ্যাবৃদ্ধিতে নয়, এমন কি নামসংকীর্তনের এলাকা বিস্তারেও নয়, কুণ্ঠিত ও বিশ্বাসহীন সমাজের উপর নাম-সত্যাগ্রহের সরাসরি আক্রমণ দ্বারা আত্মসন্তুষ্ট হওয়ার অবকাশ নেই। ব্যক্তিজীবনে জৈব ক্ষুধার মাত্রাহীন লোলুপতা, সমাজের অঙ্গে অঙ্গে হিংসা-প্রতিহিংসার পাশবিক হৌরাত্ম্য, ধ্রুবমার্গের কদর্য প্রত্যাবর্তন, সোপাকপায় মানুষকে ভজন করবার বিকৃত মানদণ্ড—এক সর্বগ্রাসী নৈতিক অবক্ষয় বঙ্গনার পুঁজি বাড়িয়ে সত্যাকে যেভাবে মসীলিপ্ত করছে, লোকশক্তির উৎসমুখকে করছে রুদ্ধ, তাতে মহামন্ত্র নিয়ে রাজপথে না ঝাঁপিয়ে পড়লে তমঃসিদ্ধ গৃহকোণও আর কঠিন রক্ষা পাবে?

পরম ভাগবত, যথার্থ অধিকারী, স্বর্গীয় হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের সতরবর্ষে

বলেছিলেন—"সত্যাগ্রহের জনক শ্রীমন্মহাপ্রভু, জাতির জনক মহাত্মাজী।" অর্থাৎ অন্তর্লীন ভাবের বিচারে নব-ভারতের পিতামহ হচ্ছেন মহাপ্রভু, পিতা গান্ধীজি।

তিনি ভক্ত, না ভগবান তা নিয়ে কূটতর্কের কতটুকু প্রয়োজন? শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যর সিঁড়ি বেয়ে বালক ও তরুণ নিমাই'র উত্তরণ। কালক্রমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভূতিরই অবতরণ তাঁর মানবসত্তায়। বিভূতির এই বিপুল সমারোহ ছাড়া তেইশ বৎসরের যুবকের জ্ঞানে ও সামাজিক প্রয়োগবিজ্ঞানে এই ঐতিহাসিক বিপ্লবের সম্ভব? বিস্তর সমসাময়িক সাক্ষ্যপ্রমাণ, লিখিত ইতিহাস না থাকলে এই দেবদুর্লভ বিজয়বার্তা সংশয়ীর সংশয় আর অবিশ্বাসীর বিদ্রূপই বাড়িয়ে চলত। মনুষ্যদেহের সীমাবদ্ধ খাঁচায় ভাগবতী-সত্তার আরোপকে মহাপ্রভুই নিজেই সমর্থন করেন নি। তাঁর শ্রীমুখেরই বাণী—'জীবে ভগবৎ বুদ্ধি মহাপাপ।' কৃষ্ণাপিত প্রাণ, তৃণাদপি বিনীত যিনি, তাঁর পক্ষেই এই ইতিহাসনিষ্ঠ ব্যবহারিক মনোভঙ্গী সম্ভব।

অতএব শ্রীভগবানের পুনরায় অবতরণের জন্য আমাদের ব্যস্ততা বা ব্যগ্রতা নিষ্প্রয়োজন। তিনি নিজের গরজেই আসবেন,—ভক্তের দরজায় তাঁর পুঁটুলি বাঁধা। প্রয়োজন হচ্ছে আমাদের উত্তরণ, উত্তরণ সমাজযোগে। কেবলই তাঁর উপর দাবী চড়িয়ে আমরা কি আসলে আমাদের সাত্ত্বতা ও সামাজিক অঙ্গীকারকেই ঘাটো করছি না? অবশ্য স্বীকার্য: কৃষ্ণচৈতন্যর বা ভগবৎকথার এলাকা দিনদিন বিস্তৃত হচ্ছে। তাঁর ধ্বনিত নামের মাধুর্য যদিও কিছু বহোস্যাদ ছাড়া সকলেরই প্রাণের সান্ত্বনা, শক্তির উৎস। এই শক্তিরই আহ্বান তাদের পর্ণকুটিরে—রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় ডালি পাঠিয়েছেন যাদের কাছে—'সবার পিছে সবার নীচে'র সেইসব মানুষের কাছে; গান্ধীজির সমাজচিন্তায় ও সংগ্রামে যাদের স্থান ছিল সবার আগে। আজ এই নিরন্ন ও বিধ্বস্ত মানুষগুলোর সঙ্গেই মেল বন্ধন চাই। চাই অলিগলির বিশৃঙ্খল যৌবনের সঙ্গে সংলাপ, অগাধ রাজপথে শান্তিময় নামের উদ্বেলতা। সত্যাগ্রহী শ্রীচৈতন্য ধর্ম ও সংঘাতের নানাক্ষেত্রে ভক্ত সেনাদল নিয়ে যা হাতেকলমে করে দেখিয়ে গিয়েছেন, চার শতাব্দী বাদে যার নবসংস্করণ নতুন প্রেক্ষাপটে উচ্চারিত হয়েছিল মহাত্মা গান্ধীর প্রতিভাদীপ্ত নেতৃত্বে লক্ষ মানুষের মিছিলে, যুগের অকরুণ প্রয়োজনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, আজ আর-এক যুগযন্ত্রণার চরম পর্যায়ে সে-ই অমোঘ অস্ত্রটিকেই 'প্রতিপক্ষের' দিকে উদ্যত করতে হবে—স্বচ্ছন্দ ও অলস গৃহকোণেই শ্রীনামকে সীমাবদ্ধ রাখার দিন বোধ করি অতিক্রান্ত।

একবার সেই লোকত্রাতা জীবনমূর্তির অবিস্মরণীয় কৃতিসমূহের উপর দৃষ্টিপাত করলে এই সিদ্ধান্তই অনিবার্য হয়ে পড়ে। রোমাঞ্চকর বহু বিচিত্র ঘটনায় গতিময় সেই চিত্রপটের শুটিকয় বর্ণোজ্জ্বল রেখা আমরা অনুধ্যান করি:

(১) বিদ্যার সত্যার্থ হচ্ছে বিনয়, নম্রতা। স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকের আবির্ভাবে অজ্ঞানের যা তামসিকতার অন্ধকার অন্তর্হিত হয়ে যায়। সর্বানুরাগের স্নিগ্ধতাই বিদ্যাজিত পুঁজি। নবদ্বীপে টোলের বিদ্যার্থী নিমাই, তার অন্যতম ধীমান সহপাঠী রঘুনাথ। রঘুনাথ ন্যায়ের টিপ্পনী লিখেছেন, ইতিপূর্বেই অনেক উঁচুমানের নিখুঁত টিপ্পনী নিমাই লিখে রেখেছেন। অননুসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন নিমাই'র টিপ্পনী নিঃসংশয়ে সর্বোচ্চ সমাদর লাভ করবে, কেননা যে-ভাব ব্যক্ত করতে রঘুনাথের ঘনঘাটা লেগেছে, তাকে নিমাই দশনংক্তিতেই আয়ত্ত করে তুলেছেন। কথাটি জানতে পেরে রঘুনাথ হতাশায় ভেঙে পড়লেন ও রোদন করতে লাগলেন। শুভবৎসল নিমাই তাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে বললেন—"এ তো সামান্য ব্যাপার, এ অসহ্য শাস্ত্র, এর আবার ভালমন্দ কী?" বলেই নিজের গ্রন্থখানি গঙ্গায় নিক্ষেপ করলেন।

(১) ...কেশব কাশ্মীরী এসেছেন নবদ্বীপে, এখানকার বিদ্বজ্জনদের জয় করতে পারলেই তিনি হবেন ভারতের অদ্বিতীয় পণ্ডিত। তাঁকে বলা হত—সরস্বতীর বরপুত্র, যাঁর ওষ্ঠাগ্রে বসে বাগদেবী স্বয়ং বিচার করে থাকেন। নবদ্বীপের কোন অগ্রজ পণ্ডিতই কেশব কাশ্মীরীর মুখোমুখী হতে সাহস পেলেন না। অগত্যা শিষ্যমণ্ডলীসহ সাক্ষাৎলাপ করতে এলেন 'নিমাই পণ্ডিত'।—কাশ্মীরী সেখানে হাজির হলেন,—তিনি এই জ্ঞানমূর্তি তরুণের খ্যাতির কথা শুনেছিলেন, তাকে দেখার আগ্রহ ছিল মনে মনে। কাশ্মীরী নিমাইকে লক্ষ্য করে বললেন —'এত অল্প বয়স তোমার? অথচ শুনেছি ব্যাকরণে তোমার বিলক্ষণ অধিকার।' নিমাই সমুচিত নম্রতার সঙ্গে বললেন—'ব্যাকরণ পড়াই সে আমার দুষ্টতা; আমিও বুঝিনা, আমার শিষ্যরাও বুঝে না। আপনি প্রবীণ, বিশ্ববিজয়ী পণ্ডিত,—আমি তো অজ্ঞ নিতান্ত বালকমাত্র।' অতঃপর নিমাই পণ্ডিত করজোড়ে বললেন—'মহাত্মন্, আপনি কিছু গঙ্গাস্তব রচনা করুন, শুনে আমরা ধন্য হই।' কেশব কাশ্মীরী স্মিতহাস্যে একের পর এক তাৎক্ষণিক শ্লোকে স্তবস্তুতি করলেন। নিমাই-শিষ্যগণ বিমুগ্ধ। নিমাইও তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করে বললেন—'আপনার কবিত্বশক্তি দুর্লভ। এক্ষণে নিবেদন, উচ্চারিত শ্লোকের দু'একটির বিচার করে আমাদের তৃপ্ত করুন।'

'বেশ, কোন্ শ্লোকটি নিয়ে বিচার করব বল?' 'বালকে'র প্রস্তাবে কাশ্মীরী বুঝিবা কিঞ্চিৎ কৌতুক বোধ করছিলেন।

কিন্তু এ কী কাণ্ড? নিমাই তৎক্ষণাৎ কাশ্মীরীর শ্লোক নিচয়ের যথা থেকে একটিকে হুবহু পুনরুচ্চারণ করলেন।

'আমি প্রায় বাত্রিবেলে আমার গৃহমধ্যে রেখেছি,— কীরূপে তুমি তা কণ্ঠস্থ করলে?' — বিস্মিত কাশ্মীরী প্রশ্ন করেন। তাঁর মনের ভাব—'এ বালক নিশ্চয় শ্রুতিধর, অন্য কিছু নয়।' নিমাই পণ্ডিত পণ্ডিতের মনের ভাবটি বোধকরি বুঝেই বললেন—'কেহ বা সরস্বতীর বরে কবি হয়, কেহ বা তার বরে হয় শ্রুতিধর।' মহাপণ্ডিতের অহংবুদ্ধি তখন কিছুটা পরাজিত। তিনি শ্লোকটির গুণগ্রাম বর্ণনা করলেন।

এবার নিমাই পণ্ডিতের নিবেদন: 'গুণ শ্রবণে কৃতার্থ হয়েছি, কিন্তু বিচারের ক্ষেত্রে শ্লোকের দোষদর্শনও আবশ্যক, অনুগ্রহ করে তা ব্যক্ত করে আমাদের ধন্য করুন।'

কিন্তু তুমি তো ব্যাকরণের সিদ্ধ-সূত্রমাত্র অধ্যয়ন করেছ অলংকার অধ্যয়ন করনি, তুমি শ্লোকের দোষগুণ কী বুঝবে? শুকনের 'স্মিত' জিজ্ঞাসায় কাশ্মীরী মন্তব্য করলেন।

নিমাই'র বিনম্র উত্তর—'পড়িনি, তবে শুনেছি, এবং আপনি অনুমতি করলে, তা থেকেই আপনার শ্লোকটির দোষ বিচার করছি', এই বলে নিমাই শ্লোকটির দোষ কোথায় তা নির্দেশ করলেন। কেশব কাশ্মীরী বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেলেন, তাঁর বিদ্যার অহংকার ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল—তিনি ত্বরিৎ স্থান ত্যাগ করলেন।

পরবর্তীকালে কেশবকাশ্মীরী নিমাই পণ্ডিতের তথা মহাপ্রভুর চরণে শরণ নেন এবং কৌপীনবন্ত হয়ে সংসার ত্যাগ করেন।

(৩) জাজপীতের মূলোচ্ছেদ:

রাজনার স্বাধীনতা তখন প্রায় লুপ্ত,—রাজা সুবুদ্ধি রায়ের শাসন চলছে শুধু নামেই। এরই এক পাঠান ভৃত্যের চক্রান্তে হিন্দু রাজাচ্যুত হন, উপরন্তু এঁর ধর্মনাশ করা হয়। গৌড়ীয় পণ্ডিতপ্রবরগণ সুবুদ্ধি রায়ের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাপত্র করলেন—তপ্ত ঘৃত পান করে কিম্বা হুতাশনে দগ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করা ও ধর্মরক্ষা করা। এই উন্মাদ আদেশ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য সুবুদ্ধি রায় বারাণসীর পণ্ডিত সমাজ সমীপে স্থান গ্রহণ

সৌভাগ্যক্রমে তখানে মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করেন। করুণাময় শ্রীচৈতন্য বললেন—'আত্মহত্যা তামসিক কর্ম, তুমি বৃন্দাবনে যাও, কৃষ্ণনাম কীর্তন করো। সমস্ত পাপতাপের অন্ত হবে, তুমি তাঁর পাদপদ্মে স্থান পাবে।' এইভাবে মহাপ্রভুর চরণাশ্রিত হয়ে বৃন্দাবনবাসী সুবুদ্ধি রায় বাকী জীবন পরম শান্তিতে অতিবাহিত করেন। (৪) ···পুণ্যশ্লোক ঠাকুর হরিদাস। জন্ম যশোহর জেলার বুঢ়ন গ্রামে। কেহ বলেন তিনি অনাথ ব্রাহ্মণসিত, মুসলিম ঘরে পালিত; আবার কাহারও কাহারও মতে, তিনি মুসলমানেরই সন্তান। বাল্যাবধি শুদ্ধ-বৈষ্ণব হরিদাসকে অত্যাচারী জমিদার কখনও শান্তি দেয়নি, লাঞ্ছিত করেছে নানাভাবে। স্থান পরিত্যাগেও রেহাই পান নি তিনি, মুসলিম সুবেদার হরিদাসকে বেত্রাঘাতে জর্জরিত করে ধর্মান্তরিত করতে প্রয়াস পেয়েছে। উত্তরে হরিদাস যা বলেছিলেন তা কিন্তু ইসলাম নির্বিশেষে সমস্ত ধর্মের মর্মকথা :

'তন বাপ সবারই এক ঈশ্বর
নামমাত্র ভেদ করে হিন্দুতে যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে।'

শ্রীনামে সমর্পিত প্রাণ হরিদাস ভক্তশ্রেষ্ঠের অটল বিশ্বাস ব্যক্ত করে বললেন—

'খণ্ড খণ্ড যদি হই যায় দেহপ্রাণ
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম।'

রক্তাপ্লুত হরিদাসকে মৃত মনে করে সুবেদারের পাইক ও কুলীরা তাকে নদীতে নিক্ষেপ করে, কিন্তু পরদিন হরিদাস সম্পূর্ণ সুস্থ দেহে প্রত্যাবর্তন করেন। সুবেদার এই ঘটনায় বিস্ময়াবিষ্ট হন এবং এর মধ্যে কোন দৈবী ইঙ্গিত অনুভব করে ভক্ত হরিদাসের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করেন ও তাঁকে স্বধর্মে ও স্বমতে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলবার সুযোগ দেন। বাহিরে অত্যন্ত অত্যাচারী একটি মানুষের অন্তরতমে যে আর-একটি মানুষের মত মানুষ বসতি করে এবং উপযুক্ত প্রেরণা ও আবেদন তার বহিরঙ্গকে ঠিক সময়ে শুদ্ধ করে দিতে পারে সুবেদারের পরিবর্তন তারি একটি দৃষ্টান্ত।

(৫) ···প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী রূপসনাতন দুইভাই-এর কথা অনেকেই জানেন; পাঠান বাদশাহের কবল থেকে অব্যাহতি লাভের আশায় মহাপ্রভুর পুণ্যদর্শনাভিলাষী সনাতন বারাণসী অভিমুখে দীর্ঘ পদযাত্রায় অবতরণ; দেহে রোগের বিস্ফোরণ হেতু সমাজে তখন তিনি অস্পৃশ্য হয়ে পড়েছিলেন, চারদিকের ঘৃণা ও অবহেলার ফলে তিনি নিজেই নিজেকে 'নীচ ও পতিত' রূপে ঘৃণা করতে শুরু করেছিলেন—প্রথম দর্শনেই মহাপ্রভু তাকে আলিঙ্গন করে সনাতনের দেহঘন ঘুচিয়ে দিলেন, ঈশ্বরপ্রণিধি মানুষের কোল পেয়ে সনাতন একজন শ্রেষ্ঠ মানুষের পংক্তিতে উত্তীর্ণ হলেন। মহাপ্রভু তাকে বললেন—শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণে সংসার বন্ধন ছিন্ন করেছ, তুমি ভক্তশ্রেষ্ঠ। তোমার অঙ্গ স্পর্শ করে আমিই পবিত্র হলাম।' 'ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা'এ যে কথার কথা নয়, আচরণীয় ব্রত, মহাপ্রভুর জীবন তার একটি প্রামাণিক জীবন্ত পুঁথি।

জগাই মাধাই'র ত্রাস বিত্রাস ও পথভ্রষ্টকে পথের হদিস দিলেন প্রভু নিত্যানন্দ, তাদের উদ্ধার করলেন প্রেমময় মহাপ্রভু। এমন করুণ নির্বান্ধব ও বহুনিন্দিত জীবনের সংখ্যা আমাদের 'সভ্য ও শিক্ষিত' সমাজে বোধ করি গণনারও বাইরে। কে এদের পথ দেখাবে, এদের জন্য নামসঙ্কির অধিকারী কজনার নিস্রাহীন রজনী কাটে?

(৬) কাজী কাহিনী মহাপ্রভুর প্রেমময় বৈপ্লবিক জীবনের এক স্বর্ণোজ্জ্বল ব্যবহারিক কৃতির স্বাক্ষর আর এখানেই তাঁর উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে নবযুগের জনক মহাত্মা গান্ধীর প্রাসঙ্গিকতা সর্বাধিক। ···কৃষ্ণাবতারকল্প

শ্রীগৌরাঙ্গের মহাভাব ও আবেশে নবদ্বীপ তখন উদ্বেলিত। শ্রীবাস অঙ্গনকে কেন্দ্র করে নামসংকীর্তনের প্রবাহে কপট শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাপকদের পুঁজি ভেসে যাওয়ার উপক্রম। তারা গোরাচাঁদের উপর যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ, হিন্দুধর্মের এই সহজ-সুন্দর সরলীকৃত জনমুখী নবযোজনার কারেমীস্বার্থ অভিসন্ধি বিপন্ন, তাই সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার চলছে অবিরত,—পরিশেষে স্থানীয় শাসনকর্তা কাজীর দরবারে মিথ্যা ও অর্ধসত্যের পুঞ্জীকৃত নালিশ।

বিনা অনুসন্ধানেই ক্ষমতাদর্পী কাজী আদেশ জারী করলেন—আজ থেকে নগরের সর্বত্র নামসংকীর্তন বন্ধ। বিষণ্ণ ও বিচলিত ভক্তকুলকে আশ্বাস দিয়ে মহাপ্রভু বললেন—'নাম তোমাদের মহাশক্তি, তাকে কখনো হেরোনা।' কিন্তু তিনি অনুভব করলেন ভক্তদের এই বিচ্ছিন্ন শক্তিকে সংঘটিত করে নামপ্রেমের হাতিয়ার নিয়ে একেবারে রাজপথে কাজীর এই কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত হুকুমের মুখোমুখি হতে হবে। তাই শ্রীনাম-সেনাপতি প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন—

'নগরে নগরে আজি করিব কীর্তন।
সন্ধ্যাকালে কর সবে নগর মণ্ডন।
সন্ধ্যাতে দেউটি সব জ্বাল ঘরে ঘরে।
দেখ কোন্ কাজী আসি মোরে মানা করে।'

নবদ্বীপধামে জেগে উঠল নবদ্বীপবাসি। হরিদাস, অদ্বৈতাচার্য, এবং শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দর নেতৃত্বে নগর সংকীর্তনের ত্রিমুখী আক্রমণ ভীত সন্ত্রস্ত হাজার হাজার নরনারীকে ভয়মুক্ত ও প্রেমযুক্ত করে রাজপথে টেনে আনল। ভিন মিছিলের মিলন হল একেবারে কাজীর গৃহদ্বারে। স্থানীয় এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে দিয়ে কাজীকে ডাকিয়ে এনে মহাপ্রভু বললেন—'আমি তোমার অতিথি, অতএব আমার উপর তোমার কোন বিরূপতা থাকা উচিত নয়।' বঙ্গসংস্কৃতির পাদপীঠ নবদ্বীপধামের মুকুটহীন সম্রাটের এই প্রীতিস্নিগ্ধ বিনীত সম্ভাষণ কাজীর হৃদয় স্পর্শ করল,—তিনি তৎমুহূর্তে তাঁর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করলেন ও কৃতকর্মের জন্য প্রকাশ্যে দুঃখপ্রকাশ করলেন।

ঘটনাগুলোর প্রত্যেকটিরই মূল শিক্ষা হল—প্রেমে পাষণ্ডও গলে, কৃষ্ণনাম বা শ্রীভগবানের নামকীর্তন এই প্রেমেরই সর্বাত্মক সন্দেশ বিতরণ, যা সকল রোগ হরণ করে। মহাপ্রভু দিব্যালোকের মত সুস্পষ্টভাষায় উচ্চারণ করলেন—যেমন উপায় তেমন উদ্দেশ্য, যেমন সাধনা তেমন সিদ্ধি, যেমন পন্থা তেমন প্রাপ্তি। প্রেম দিয়েই প্রেমকে অর্জন করতে হয়। গোলাপই যদি হয় বাঞ্ছিত, তাহলে গোলাপেরই বীজ রোপণ করা চাই। প্রেমের রাজ্যেই বৈকুণ্ঠ, আর এই বৈকুণ্ঠ প্রত্যেকের হৃদয়ে। এই হৃদয়ে প্রবেশের একমাত্র রাজপত্তও, তাই, প্রেম। মহাপ্রভু প্রবর্তিত নামও এই প্রেমেরই একটি সোচ্চার ও সর্বনাথা রূপ।

এই সর্বাত্মক প্রেম ছাড়া সংস্কৃতি অর্থহীন, নিছক পণ্ডিতী বাগাড়ম্বর। সংস্কৃতি তো বহিরঙ্গের বস্তুই নয়। সভ্যতার প্রাণ এবং প্রাণহীন অন্তবস্তুর সমাবেশ, কিন্তু সংস্কৃতিতে তবুই প্রাণের সাড়া। সভ্যতার নির্যাস নিষ্কৃততম সকলটিই হচ্ছে সংস্কৃতি। প্রাণে প্রাণে যা সেতুবন্ধ রচনা করে তা-ই সংস্কৃতি। যার কোন ভাষান্তর বা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হয় না।

'পতিত ও অবনত' মানুষের প্রতি নিবিড় প্রেমের আকুতিতে মহাপ্রভু বঙ্গসংস্কৃতির জন্মান্তর ঘটিয়েছেন; ধর্ম ও সংঘাতের ক্ষেত্রে সংস্কৃতি সমস্ত উত্তরণের পথ প্রদর্শন করেছেন। গান্ধীজির সত্যাগ্রহ এই উত্তরাধিকারেরই এক যুগমান্য ও জরুরী সংস্করণ।

প্রেমের যুদ্ধে সত্যসত্যই কোন প্রতিপক্ষ থাকেনা,—সবই আত্মপক্ষ। প্রশ্নটা শুধু উত্তরণের।

রাজপ্রাসাদ থেকে পর্ণকুটির পর্যন্ত গান্ধীজির নেতৃত্বাধীন মুক্তিকামী ভারতবর্ষ প্রেমের ভাষাটিকেই পদে পদে যাচ্ঞা করেছে। তাই না মহাত্মাকে লক্ষ্য করে বিশ্বকবি ঋষি রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—'আমরা সবাই গান্ধীমহারাজের শিষ্য। কেউ বা ধনী কেউ বা নিঃস্ব।'

গৌড়বঙ্গের কোণে কোণে এবং বহির্বঙ্গের সংস্কৃতির অঙ্গনে নামপ্রেমের আলোকমালা সাজিয়ে মহাপ্রভু বাঙালী হৃদয়ের আসন স্থানটি চিহ্নিত করেছেন। এই হৃদয়ের অপার ঐশ্বর্যের সন্ধান উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। জীবন ছন্দের কবি সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় এই মর্মবাণীই একটি অনুপম ছন্দে গাঁথা—

'বাঙালী হৃদয় অমিয়া ছানিয়া।
নিমাই গড়েছে কায়া।'

আজ আর-এক দুর্যোগের রাত্রি চলেছে ভারতের জীবনে। স্বাধীনতা তার জীবনে এসেছে। অনেক বস্তুপ্রাপ্তিতে শিল্পে বিজ্ঞানে নতুন ভারতের কৃতিত্ব সম্বেহাতীতরূপে গৌরবময়। —কিন্তু কোথায় সেই মানুষ, কোথায় সেই প্রাণের সাড়া? শুভ মনের শুভ কোথায় সেই উদ্বেগ ও বেদনা? আজ যে আর মানুষকে চেনাই যায় না—বহির্বঙ্গের এত সম্পদের মধ্যেও অন্তরঙ্গের এই দারিদ্র্য কোন্ ইতিহাস লিখে রাখছে ভারতের ভাগ্যলিপিতে? মহাপ্রভুর কালের সেই পাণ্ডিত্যাভিমান আজকের পণ্ডিত বা বিজ্ঞানদের মধ্যে আরো বেশী নির্মমভাবে প্রকট; আজও যদিও বণিকের অনুপম মানুষের বিবেকের কণ্ঠরোধ করছে,—যদিও তাদের রং আজ আর সাদা নয়। অনেক মানুষ হয়ত আজকের স্বাধীন রাষ্ট্রে অনেক কিছু পাচ্ছে কিন্তু যা পেলে সব পাওয়া হয়, যা হচ্ছে সব জীবনে প্রবেশের চাবিকাঠি, তা মর্মান্তিকরূপে অনুপস্থিত। মহাপ্রভুর ও মহাত্মাজীর সেই অবাধ নাম ও প্রেমের মধ্য দিয়েই ভোগোন্মত্ত মানুষের এই কালরাত্রির অবসান হতে পারে। প্রতীক্ষাকে আর দীর্ঘতর হতে দিলে উত্তরাধিকারীর সমস্ত মর্যাদা আমরা হারাব।

সংকটেই সংস্কৃতির পরীক্ষা। বঙ্গসংস্কৃতি বাকপটু দুর্বলদের সংস্কৃতি নয়। সত্যাগ্রহী চেতনায় সংস্কৃতি কত সবল হতে পারে ভারতের পূর্বদিগন্তে মহাপ্রভুই তা প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন, আর ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে এই ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার মহাত্মাজীকে কেন্দ্র করে সারা ভারতের সাংস্কৃতিক চিত্রপটে বঙ্গসংস্কৃতিকে অভূতপূর্ব মর্যাদা এনে দিয়েছে। নাম-প্রেমের প্রয়োগবিজ্ঞানই বর্তমান যুগসংকটেও পরিত্রাণের পথ।

—:০:—

দেখাও তোমার প্রসন্ন রূপ

শান্তশীল দাস

কৃষ্ণ, তোমার প্রসন্ন রূপ
দেখতে যে চাই, দেখাও আমায়;
ভয় পেয়ে নয়, আনন্দেতে
এ মন তোমায় পেতে যে চায়।

আপন মনের কপাট ধরে আনন্দময়,
এস তুমি আমার ঘরে পরম অভয়;
মনের সাধে দেব তুলে
অর্ঘ্য আমার ওই দুটি পায়।

দিনে রাতে নানান্ রূপে
আসে যারা আমার কাছে,
একান্ত যে আপন তাকে
পাইনে আমি তাদের মাঝে।

এস তুমি, এস আমার চির আপন।
আমার হৃদয়-দেবালয়ে করবো বরণ;
দেখবে না কেউ আমার পূজা
সেই নিভৃতে, সেই নিরালায়।

—:০:—

সৃষ্টিতত্ত্ব—আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এবং আমাদের শাস্ত্রে

শ্রীঅক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের চারিদিকে কী অপার অনন্ত বিস্ময় ছড়িয়ে রয়েছে ভাবলে মন অসীম আনন্দে ভরে যায়। আমাদের চোখ আছে দেখি না, কান আছে শুনি না, কারণ অনেক সময় আমরা দ্রষ্টব্য বা শ্রোতব্য বিষয়ে মনঃসংযোগ করি না। তাছাড়া চোখ কান প্রভৃতি বহির্বিন্দ্রিয়গুলির ক্ষমতা খুবই সীমিত। কিন্তু আমাদের অন্তরিন্দ্রিয় মন, যে এই বহির্বিন্দ্রিয়গুলির পরিচালক, যে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলির খবর অতীন্দ্রিয় অন্তরাত্মার কাছে পৌঁছে দেয়, তার ক্ষমতা এত সীমিত নয়। সে ইচ্ছা করলে ইন্দ্রিয়গুলি মারফৎ সব গ্রহণ যোগ্য বিষয়ের খবর ত' নিতেই পারে, অনেক অদেখা জিনিষের, অশোনা বিষয়ের খবর তার মননশক্তি দিয়ে প্রভু অন্তরাত্মার কাছে হাজির করতে পারে। আমাদের মনের এই শক্তি এক পরম বিস্ময়ের ব্যাপার। আক্টোপাস্ যেমন তার অনেকগুলি হাতকে ইচ্ছামত প্রসারিত ক'রে গ্রাহ্য বিষয়কে ধরতে পারে মনও তেমনই আমাদের ইন্দ্রিয়বর্গকে বিষয় গ্রহণের জন্য প্রসারিত করতে পারে। তাদের সীমিত ক্ষমতার না কুলালে, মননশক্তিকে কাজে লাগায়, উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে যন্ত্র আবিষ্কার ক'রে জ্ঞান আহরণের ক্ষমতা বাড়িয়ে নেয়। মানুষ যখন থেকে তার এই মননশক্তি সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে তখন থেকে তার জগত বিস্তৃত থেকে বিস্তৃতর হ'য়ে চলেছে। জ্ঞান রাজ্যের অপার বিস্ময়ের দ্বার একের পর এক উদ্ঘাটিত হয়ে চলেছে।

পারিপার্শ্বিক জগতের অনন্ত বিসর্গ দোলা—গহন অরণ্যের নিস্তব্ধতা, সীমাহীন সাগরের অশান্ত গর্জন, অসীম নীল আকাশের মাঝে অগণিত নক্ষত্র, মানব মনে প্রথম বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিল। তার সাথে ইহজিৎ ও জীবজগতের অনন্ত বৈচিত্র্য ও তাদের জন্মমৃত্যুর প্রবাহ গভীর রেখাপাত করেছিল। শোক দুঃখ হর্ষ বিষাদের অনুভূতি মানুষ মনের নব নব স্ফুরণের মধ্যে জীবন-জিজ্ঞাসার উদয় হ'ল—জীব ও জড় জগতের বিবর্তনের আদি কোথায়, উৎস কি, জানবার জন্য চিন্তাশীল মানুষ ব্যাকুল হ'ল, সৃষ্টির পিছনে স্রষ্টা কেউ আছে কিনা জানতে চাইল, তাঁকে দেখতে চাইল। মনুভাবে নানা দেশে নানা কালে এই জানবার দেখবার সাধনা চলে আসছে—যার ফলশ্রুতি বিভিন্ন দর্শন। আমাদের দেশে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা তাঁদের মনন-নিদিধ্যাসনের মধ্য দিয়ে ধ্যানদৃষ্টিতে যা দেখেছিলেন তাই শ্রুতি মারফৎ আমাদের দিয়ে গেছেন। ভারতীয় দর্শনের তাই হ'ল উৎস। লিপি আবিষ্কারের বহু সহস্র বছর পূর্বে হ'তেই ঋষিদৃষ্ট মন্ত্রগুলি শ্রুতি সহায়ে ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়ে এসেছে। ঋগ্বেদ এই জ্ঞানভাণ্ডারকে পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থরূপে ধারণ ক'রে রেখেছে। জগতের সৃষ্টিরহস্য আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে ঋগ্বেদের "নাসদীয়" সূক্তে প্রতিধ্বনিত। দশম মণ্ডলের ১২৯ সংখ্যক সূক্তে মাত্র সাতটি মন্ত্রের মাধ্যমে বিশ্বের প্রাক্সৃষ্টির অবস্থা ত্রিস্টুপ ছন্দে বর্ণনা ক'রে প্রজাপতি ঋষি সৃষ্টিরহস্য ভেদের চেষ্টা করেছেন। প্রথম মন্ত্রটি আরম্ভ হয়েছে "নাসদাসীন্নোসদাসীত্তদানীং" দিয়ে, তাই এই সূক্তটির নাম "নাসদীয়" সূক্ত। সূক্তটির মধ্যে যে তাবটি ব্যক্তিত সংক্ষেপে বলতে গেলে তা হ'ল, তখন সৎও ছিল না অসৎও ছিল না; না ছিল পৃথিবী, না ছিল দূর বিস্তার আকাশ; আবরণ করে এমন কিছুই ছিল না; কোথায় কার স্থান? গহন গভীর জল ছিল কি না ছিল এ সব প্রশ্ন সমাধানের যোগ্য নয়। তখন না ছিল মৃত্যু, না ছিল অমরত্ব, না ছিল রাত্রি না দিন; বায়ুরও অস্তিত্ব ছিল না। তমসা, গাঢ় তমসা দ্বারাই আবৃত ছিল। তপস্যার প্রভাবে একমাত্র অবিদ্যমান বস্তুসমূহের দ্বারা আচ্ছন্ন হ'য়ে স্বসত্তায় বিরাজিত হ'লেন। তিনি বুভিক্ষুক। তাঁর মধ্যে কামনার উদ্ভব হ'ল। তা থেকেই সৃষ্টি। শেষের

বিকের থেকে প্রশ্ন থেকে গেছে কোথা হ'তে এ সৃষ্টি হ'ল ? পরম ধামে প্রভুরূপে যিনি আছেন তিনিই জানলে জানতে পারেন সৃষ্টি কি থেকে, কোথা হ'তে কার দ্বারা হ'ল।

নাসদীয় সূক্তটির প্রসিদ্ধি এবং ব্যঞ্জনা সৌন্দর্য্যের জন্য সম্পূর্ণ সূক্তটি এখানে পরিবেশিত হ'ল—

ঋক্‌বেদ, ১০ম মণ্ডল ১২৯ সূক্ত। পরমাত্মা দেবতা। প্রজাপতি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দ।

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো
ব্যোমাপরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্‌গহনং গভীরম্‌ ॥ ১

ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস ॥ ২

তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্‌।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্‌ ॥ ৩

কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্‌ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা ॥ ৪

তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষামধঃ স্বিদাসীদুপরী স্বিদাসীৎ।
রেতধা আসন্মহিমান আসন্ত স্বধা অবস্তাৎ
প্রযতিঃ পরস্তাৎ ॥ ৫

কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত আজাতা কুত
ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্ব্বাগ্‌দেবা অস্য বিসর্জ্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূব ॥ ৬

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্‌ সো অঙ্গ বেদ যদি বা
ন বেদ ॥ ৭

উপনিষদের যুগেও সেই জগৎকারণের অনুসন্ধান ধ্বনিত হচ্ছে—

"কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা:
জীবাম কেন ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ।
অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু
বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্‌।"
[শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ১।১]

এখানে ঋগ্বেদের 'তদেকং ব্রহ্মনামধেয় হয়েছেন মাত্র। ঋগ্বেদের "নাসদীয়" সূক্তের প্রাক্‌সৃষ্টি অবস্থার বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিল রয়েছে মনুসংহিতার সৃষ্টি প্রকরণে, কেবল ভাষার তফাৎ।

"আসীদিদন্তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্‌।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ ॥" ১০

এ ছিল এক তমসাচ্ছন্ন জ্ঞানের অতীত অবস্থা, যা কোন লক্ষণ দিয়ে অনুমান করা যায় না, যা যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝানো যায় না, জানা যায় না,—যেন প্রগাঢ় নিদ্রামগ্ন অবস্থা।

সৃষ্টির পূর্ব্বের বর্ণনায় ঋষিদের ধ্যান ধারণার সঙ্গে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের ধারণার কোন পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। বিশ্বসৃষ্টির উপাদান কারণ সম্বন্ধেও তাঁদের ধারণা বস্তুতান্ত্রিক হ'লেও ঋষিদের ধারণার খুব কাছে চলে এসেছে।

বিংশ শতাব্দীর অন্তি পারমাণবিক যুগে পৌঁছে অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির ও গণিত বিজ্ঞানের সহায়তায় এখনকার বৈজ্ঞানিকগণ যে সত্যে পৌঁছেছেন আমাদের ঋষিদের ধ্যান নেত্রে সে সকল সত্য এবং তদতীত সত্যেও তাঁরা হাজার হাজার বছর আগে কিভাবে পৌঁছেছিলেন ভাবলে বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় আনন্দে মন ভরে যায়। ঋষি প্রণীত আমাদের শাস্ত্রে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনার পূর্ব্বে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের এ বিষয়ে ধারণা কতদূর পৌঁছেছে সে বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বপরিচয় গ্রন্থে তাঁর সময় অবধি আবিষ্কৃত পরমাণু বিষয়ক সব তথ্য দিয়েছিলেন অতি সহজ ভাষায়, যা অবৈজ্ঞানিক পাঠকের বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না। সৃষ্টির মূল উপাদানের খোঁজে মৌলিক পদার্থগুলির পরমাণুর মধ্যে বৈজ্ঞানিকরা অনুসন্ধান চালিয়ে তাদের ভেতর একটী nucleus-কে (কেন্দ্র) ঘিরে এক বা একাধিক negative তড়িতাত্মক

electron-এর দূর্ণনের সন্ধান পান। এক একটি পরমাণু যেন এক একটি সৌরজগৎ। সৌরজগতের আকর্ষণ যেমন বস্তু পদার্থের (mass—বা ভরের) ওপর নির্ভরশীল পরমাণুর জগতে কিন্তু এই আকর্ষণ বিকর্ষণ তড়িতাত্মক। একটি পরমাণুতে যতগুলি negative তড়িতাত্মক electron থাকে nucleus-এর proton-এ থাকে বিপরীত ধর্মী (অর্থাৎ positive তড়িতাত্মক) সমান মাপের তড়িৎ শক্তি। তা না হ'লে electron-দের পরমাণুর মধ্যে ধরে রাখা যেত না। proton-এর এই positive তড়িৎ শক্তি আসে তার সঙ্গে অড়াজড়ি ক'রে থাকা positron নামক তড়িৎকণা থেকে। Electron, positron বস্তুকণা (Particle), তবে তাদের ভর নাম মাত্র। এদের ভর সমান ; এদের ভর যদি এক ধরা হয় তা হ'লে proton-এর ভর প্রায় ১৮৩৬, এবং nucleus-এ proton এর সঙ্গে অড়াজড়ি করে neutral তড়িতাত্মক যে বস্তুকণা (particle) থাকে, যার নাম দেওয়া হয়েছে neutron, তার ভর হবে ১৮৩৭। পরমাণুলোকের এই কণাগুলি সব মৌলিক পদার্থের পরমাণুতেই এক ধিমিধ ; তাদের বিভিন্নতা নেই। তাদের মূল বস্তুকণা (fundamental particles) বলা হয় ; কিন্তু তড়িতাত্মক শক্তির আধারস্বরূপেই তাদের পরিচয়। Nucleus-এর neutron-কেও ভাঙা সম্ভব হয়েছে। তা থেকে একটি electron বের হ'য়ে এলে neutron রূপান্তরিত হতে পারে proton-এ। পরমাণু জগতের এ সব মূল উপাদানের আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে তেজস্ক্রিয় পদার্থের রশ্মি-বিকিরণের আবিষ্কার থেকে। এই রশ্মি-বিকিরণের কথা বুঝতে হ'লে আলোক রশ্মির বিকিরণ সম্বন্ধে কিছু ধারণা থাকা দরকার। আমাদের এই পৃথিবীতে আলোর মূল উৎস ত' সূর্য্য ; নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূর থেকে তার আলো এখানে পৌঁছাতে ৮ মিনিটেরও বেশী সময় লাগে। আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল, প্রায় তিন লক্ষ কিলোমিটার। এই আলোক রশ্মি এই গতিতে যে ছুটে আসে বৈজ্ঞানিকদের গবেষণায় তার ধরণ ধরে বলতে বলতে মূল পদার্থ কণিকার বিভিন্ন বৈর্ঘ্যের তরঙ্গে ভর করে ছুটে আসা। আগে এই তরঙ্গের বাহন ইথার কল্পনা করা হ'ত, এখন এই কল্পনা বাতিল করে মনে করা হয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ রয়েছে তড়িতাত্মক ব্যাপ্তি (electro magnetic field) দিয়ে এবং একেই আশ্রয় করে যত রকম sub-atomic particles আছে তাদের বিভিন্ন তরঙ্গ বেয়ে বিভিন্ন গতিতে চলা ফেরা।

প্রথমেই বলেছি আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির ক্ষমতা কত সীমিত। বিভিন্ন মাপের তরঙ্গ তুলে আলোর যে ছুটে আসা, তার সবগুলি আমাদের চোখ দেখতে পায় না। সাদা আলোকে prism-এর মধ্যে দিয়ে পাঠালে রামধনুর সাতরঙ্গা যে আলো আমরা দেখতে পাই তাদের প্রত্যেকটির তরঙ্গ বৈর্ঘ্য আলাদা। বিভিন্ন তরঙ্গ বৈর্ঘ্যের আলোক রশ্মির যে বর্ণালী (spectrum) আমাদের চোখে তার খানিকটা মাত্র দেখা যায়, বাকী থেকে যায় একদিকে infra-red রশ্মি আর একদিকে ultra-violet রশ্মি। অদেখা infra-red-এর দিকে থাকে উত্তাপতরঙ্গ ও রেডিওতরঙ্গ—যাদের তরঙ্গ বৈর্ঘ্য ক্রমশঃ বড়র দিকে ; আর ultra-violet-এর দিকে থাকে ক্রমশঃ ছোট বৈর্ঘ্যের তরঙ্গ এবং এই পর্য্যায়ে পড়ে রঞ্জন-রশ্মি বা X-ray, গামা রশ্মি ইত্যাদি।

পরমাণুলোকের ভেতরের ভাঙাগড়ার আলোকে যাঁরা গামা রশ্মির দেখা মেলে, তার ভেতর গামা রশ্মিই সবচেয়ে শক্তিমান জানা ছিল। তারপর জানা গেল তার থেকে বহুগুণ শক্তিশালী মহাজাগতিক রশ্মির কথা (cosmic-rays)। মহাবিশ্বের কোথায় এর উদ্ভব—কোন্ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির প্রক্রিয়ার ফলে এ রশ্মি যাঁকে যাঁকে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হচ্ছে এখনো সঠিক নির্ণয় হ'ল না। যাঁরা বিশ্ব সৃষ্টির শুরুতে Big-Bang Theory-তে বিশ্বাসী তাঁরা মনে করতে পারেন সেই বিরাট বিস্ফোরণের ফলে এই মহাজাগতিক রশ্মির বিকিরণ। আণবিক বোমা ও হাইড্রোজেন বোমার যুগে বাস করে ফিউসন্ ও ফিসিয়ন্ ক্রিয়ার যে বিধ্বংসী বিস্ফোরণ ঘটতে পারে তা অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু মহাবিশ্বের সমূহ উপাদান পুঞ্জীভূত হ'য়ে মহাবিস্ফোরণ (Big Bang) সৃষ্টির

আছিতে ঘটে থাকবে এ মতবাদ সম্বন্ধে অনেক বৈজ্ঞানিক সন্দিহান হয়েছেন। American Mathematical Society র Dr. Richard L. Thompson বিশ্বাস করেন, ঐ রকম বিস্ফোরণ বিশৃঙ্খল বল থেকে জীবন সৃষ্টির পর্যায় আসতে পারে না। তিনি এক পরম নিয়ামক চৈতন্য শক্তিতে বিশ্বাসী। আমেরিকার NASAর মহাজাগতিক রশ্মির উৎস সন্ধানে U-2 jet মহাকাশে পাঠি হয়েছিলেন। ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এ বিষয়ের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, তাঁরা Big Bang Theory একেবারে বাতিল ক'রে না দিলেও মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি "finely orchestrated" বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মতে "The expansion of the Universe was serene, highly controlled and completely uniform···more like the blossoming of a plant or flower" অর্থাৎ বিশ্বসৃষ্টির প্রক্রিয়াটি যেন বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গীত মূর্ছনার একটি সূক্ষ্মকাল। মহাবিশ্বের বিস্তার এত স্থির শান্ত অতীব সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসম্পাদনে সমতা সম্পন্ন যে, একে একটি ফুলের বিকাশ অথবা ফুলের ফুটে ওঠার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। আমাদের প্রীতগবানের নাভিকমল প্রস্ফুটিত হওয়ার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

মহাজাগতিক রশ্মি অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, এবং প্রচণ্ড গতিতে আমাদের পৃথিবীর আকাশের বায়ুস্তরে প্রবেশের পূর্বে Van Allen's Belt এ শোষিত হ'য়ে বেশীরভাগ মেরুপ্রদেশে জমা হয়। তারপরেও যা আসে চারিদিক পরিব্যাপ্ত করে তাও কম নয়, এবং আমার পথে কত পরমাণুর তালচুর ঘটিয়ে secondary particles-এর সৃষ্টি করে।

এই তালচুরের খেলায় ফোটন্ (আলোক কণিকা) ভেঙে electron positron-এ রূপান্তরিত হয়, আবার কত electron positron যা খেয়ে একত্রিত হয়ে জ্যোতি দেহা দিয়ে অদৃশ্য হ'য়ে যায়। এই অদৃশ্য জ্যোতিই কি আমাদের পরম পুরুষের বিভূতি আর শক্তির খেলাই কি পরাপ্রকৃতির লীলা। পরমাণু বিজ্ঞানীরা বিশ্বের মূল উপাদানের খোঁজে এখনো গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন, অঙ্কের হিসাব ছাড়িয়ে তাঁরা শক্তিরাজ্যে পৌঁছেছেন, পরমাণুলোকে electron, proton, neutron, positron ছেড়িয়ে leptons, mesons resonance masons, hyperons এবং তাদের কত প্রকারভেদের রাজ্যে পৌঁছে গেছেন। সে রাজ্যের photon তাঁদের বিস্মিত করে না। "অণোরণীয়ান মহতো মহীয়ান" এই মহাবিশ্বের রূপ দেখেও, বিশ্বব্যাপী মহাশিল্পের রাজ্য দেখেও কি তাঁদের মহাশিল্পীকের কথা মনে পড়ে না? মহাকাশে লক্ষকোটি সৌরজগতের, লক্ষকোটি আলোকবর্ষের ওপারে সুদূর নীহারিকার হাতছানি তাঁদের মহাকাশের অনন্ত বিস্তারের খবর দিলেও অনাদি অনন্ত নিশ্চয়তার কথা কি তাঁরা চিন্তা করেন না?

আমাদের ঋষিরা কিন্তু অন্তরিক্ষের ভাবনায় পৌঁছে বিশ্বনিয়ন্তার ভাবনায় মগ্ন হ'য়ে গিয়েছিলেন। যাঁকে পেলে আর সব ভাবনা তুচ্ছ হ'য়ে যায় তাঁর খোঁজেই নিজেদের সমাহিত করেছিলেন। ধ্যানযোগে তাঁরা পরম সত্যে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

ঋষি প্রণীত আমাদের বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে সৃষ্টিতত্ত্বের যে ধারণাটি ফুটে উঠে তা আমরা প্রতিদিন সন্ধ্যাহ্নিকের সময় তিনটি ঋক্‌মন্ত্র সহযোগে স্মরণ করি। এত সংক্ষেপে মহাবিশ্বের সৃষ্টির কথা আর কোথাও বিধৃত হয়েছে বলে জানা নেই। সেই ঋক্ তিনটি হ'ল :

ওম্ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রোর্ণবঃ॥
ওম্ সমুদ্রাদর্ণবাদধিসংবৎসরোঽজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী॥
ওম্ সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ॥

[ঋক ৮অঃ ৮মঃ ৪৮সূঃ প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া]

সৃষ্টির পূর্বাবস্থায় একমাত্র ঋত বিরাজমান ছিলেন, যা থেকে সত্যের আবির্ভাব, "অন্নাদ্যস্য ঋতং"—যা থেকে সকলের সৃষ্টি। ঋক্‌বেদের পুরুষসূক্তে (১০ মণ্ডল, ৯০ সংখ্যক সূক্ত) এই পরম পুরুষকেই সহস্রশীর্ষ, সহস্রাক্ষ,

সহস্রপাৎ বিরাট পুরুষরূপে বর্ণনা করা হ'য়েছে। তাঁ থেকেই সব সৃষ্টি বিভিন্ন উপনিষদেও এই কথাই বলা হ'য়েছে। ছান্দোগ্যের কথাই এখানে তুলে ধরছি—"সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীদ্ একমেবাদ্বিতীয়ম্।" (৬।২।১)। চতুঃশ্লোকী ভাগবতের প্রথম শ্লোকে সেই পরমপুরুষের মুখে ব্যক্ত একই কথা।

"অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্।" ১

সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল আমিই ছিলাম। আমি ভিন্ন সৎ (স্থূল) অসৎ (সূক্ষ্ম), এবং এই উভয়ের কারণ কিছু ছিল না। সৃষ্টির পরেও আমি, সৃষ্ট জগদ্রূপে যাহা কিছু প্রতীত হয় তাহাও আমি এবং যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে তাহাও আমি।

প্রাক্ সৃষ্টি অবস্থা থেকে স্বয়ম্ভূ অব্যক্ত ভগবান, আকাশাদি মহাভূতকে অপ্রতিহত তেজের দ্বারা প্রকাশিত করিয়া তমোনুদ্রা রূপে প্রকট হ'লেন।

["ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্।
মহাভূতাদি বৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসাত্তমোনুদঃ।
—মনুসংহিতা ১।৬]

সেই অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য সূক্ষ্ম, অব্যক্ত সনাতন সর্ব্বভূতময় অচিন্ত্য ঈশ্বর স্বয়ং আবির্ভূত হ'লেন।

[যোঽসাবতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ
সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্বভৌ। মনু ১।৭]

দেবীভাগবৎ পুরাণে তাঁর স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে এইভাবে—

"যত্তচ্চেদং ময়া বিশ্বমেতৎ প্রোক্তঞ্চ সর্ব্বদা।
চৈতন্যমেকমাত্মস্থমহিতং ভেদজাতং নিধিম্।"৮।১।২৯

তিনি বিশ্বে ওতপ্রোতঃ ভাবে বিরাজ করছেন, তিনি ভেদোময় আদি অন্ত রহিত চৈতন্যময় পুরুষ।

তিনিই জগদাধার, জগৎকারণ—তিনি ছাড়া কিছু নাই কেহ নাই।

সেই জগৎকারণ বিশ্ববিধাতা প্রথমে জল সৃষ্টি করে তাতে তাঁর বীর্য্য আধান করলেন। উহা সুবর্ণবর্ণের সূর্য্যের মত প্রভাবিশিষ্ট এক অণ্ডে পরিণত হ'ল। সেই অণ্ডে পরমাত্মা স্বয়ং সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মারূপে জন্মগ্রহণ করলেন। ভগবান ব্রহ্মা সেই অণ্ডে সংবৎসর-কাল থাকিয়া ধ্যান বলে উহাকে দুইভাগে বিভক্ত করিলেন। তিনি সেই দুইভাগের ঊর্দ্ধ খণ্ডে স্বর্গলোক ও নিম্ন খণ্ডে ভূলোক নির্ম্মাণ করিলেন, মধ্যভাগে আকাশ অষ্টদিক এবং সাগর জলস্থান নির্ম্মাণ করিলেন।

সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে মনুসংহিতার (১।৮-১৩) এই বর্ণনা অন্যান্য সংহিতা ও পুরাণে নানাভাবে প্রতিফলিত হ'য়েছে। এটী বিশ্বের বহিরাবরণ সৃষ্টির বর্ণনা।

পুরাণের বর্ণনার মধ্যে বিশেষত্ব হচ্ছে মহর্ষি কপিলের সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যানে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সংযোগ। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে বিংশ অধ্যায়ে ১২-৫০ শ্লোকে সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে—মনুগণের উৎপত্তি পর্য্যন্ত। ব্রহ্মার মন থেকে মনুগণের উৎপত্তি মানব সৃষ্টি বলা যেতে পারে। এখানে মহর্ষি কপিলের সাংখ্যতত্ত্ব ছাড়াও বিরাট অণ্ড থেকে আরম্ভ ক'রে মানব সৃষ্টির বর্ণনা করা হয়েছে। অব্যক্তা প্রকৃতি সেখানে ক্ষুব্ধোভিত হ'য়ে পঞ্চতন্মাত্রাদি সৃষ্টি হ'লে কিভাবে যেন চৈতন্যহীন অণ্ডকোষ সাগরজলে ভাসিত হ'ল। পরমেশ্বর তখন গর্ভোদ নারায়ণরূপে এক সহস্র বৎসর ভাসে থাকলেন। তখন তাঁর নাভিদেশ থেকে পদ্মের উৎপত্তি এবং তা থেকে ব্রহ্মার। এর পরের বর্ণনা এই মহাপুরাণের নিজস্ব।

মহর্ষি কপিলের সাংখ্যতত্ত্বে পুরুষ নির্গুণ, প্রকৃতি তাঁর সান্নিধ্যে কেবল ঈক্ষণ শক্তির প্রভাবে "সৃজতে স চরাচরম্"—সকল চরাচর সৃষ্টি করেন।

ভগবদ্গীতায় পুরুষোত্তম মতবিশেষাতিত্ত্ব। তিনি নির্গুণ নিরঞ্জন ব্রহ্ম, বিকারশূন্য নির্ব্বিকল্প নিরাকার। যে সৃষ্টি কর্ত্রী পুরুষ সৃষ্টিকল্পে প্রকৃতিকে ঈক্ষণ করেন, তিনি গীতার পরাপ্রকৃতি এবং বিকারী ক্ষুব্ধোভিত প্রকৃতি অপরা প্রকৃতি। [ভগবদ্গীতা ৭।৫]

চৈতন্যময় পরব্রহ্মকে মেনে নিলে তাঁর সৃষ্টি প্রকরণ বোঝার অসুবিধা হয় না। সে ক্ষেত্রে যুক্তিগ্রাহ্য বিবর্ত্তন-বাদও বেমানান হয় না। এমনকি বাইবেল কথিত "God said, let there be light and there was light"-এ বিশ্ব সৃষ্টির প্রথম ধাপ হিসাবে গ্রহণ করতে

যাবা নাই। আধুনিক বিজ্ঞান সৃষ্টিকে মানে, স্রষ্টাকে মানতে চায় না। মহাবিশ্বে সক্রিয়মান শক্তি পুঞ্জীভূত হ'য়ে জড়জগতের সৃষ্টি, কোটি কোটি সূর্য্য, নীহারিকা, অনন্ত মহাকাশপটে বিস্ফারিয়মান বিশ্বে ঘূর্ণায়মান গ্রহ-তারার নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে অবস্থিতি—সবই বিজ্ঞান বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছে—সৃষ্টিতত্ত্বের পারম্পর্য্যক্রমে একটা মতবাদও খাড়া করেছে। কিন্তু জড় থেকে জীব-সৃষ্টির প্রক্রিয়া এখনো বৈজ্ঞানিকরা বোঝাতে পারছেন না। তাঁদের ধারণা পৃথিবীতে জল ও বায়ুর উৎপত্তির ফলে অনুকূল পরিবেশে জড়জগতের মত আপনা থেকেই জীবের সৃষ্টি হ'ল।

সমস্ত জীবজন্তু ও মানুষের দেহ জড়পদার্থেই তৈরী। জড় থেকে তফাৎ এই যে, জৈব অণুগুলি জড় অণু থেকে অনেক বড় বড় হয় এবং এই জৈব যৌগিক অণুগুলির প্রধান উপাদান কার্ব্বণ। বায়ুর প্রধান উপাদান নাইট্রো-জেন ও অক্সিজেন, জলের হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। সমুদ্রের জলে দ্রবীভূত মিথেন গ্যাস, যার উপাদান কার্ব্বণ ও হাইড্রোজেন। কার্ব্বন অণু অন্যান্য পরমাণুর সঙ্গে মিশে প্রকাণ্ড অণু তৈরী করতে পারে। সমুদ্রের জলে দ্রবীভূত মিথেন মিশ্রণের ওপর মহাজাগতিক রশ্মি পড়ে তাকে রূপান্তরিত করলো জীবনের আধারের উপ-যোগী জৈব পদার্থে। এ পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকের বিশ্লেষণে ত্রুটী নাই। ত্রুটী নাই জীব বিবর্ত্তনের ধারা বিশ্লেষণে, কিন্তু প্রথম জীব সৃষ্টি, আধারে প্রাণ প্রতিষ্ঠা কি করে হ'ল তার কৈফিয়ত আজও বিজ্ঞান দিতে পারেনি।

জীবকোষে প্রথম প্রাণ সঞ্চার—সে রহস্যভেদ এখনো সম্ভব হয়নি। সে কোন ব্যাকটিরিয়া বা ভাইরাস অণুতে কিনা কেউ বলতে পারে না। ব্যাকৃটিরিয়া উদ্ভিদ জাতীয়, প্রাচীনতম এককোষী প্রাণী অ্যামিবা জাতীয় বলিয়াই অনুমান।

প্রাণ হ'তে প্রাণের জন্ম প্রকৃতির নিয়ম। এককোষী অ্যামিবার বংশ বৃদ্ধি হয় একটী cell (কোষ) বিভাগ হ'য়ে দুটী হ'য়ে। অন্য জীবের (bisexual প্রাণীর) বংশধারা বজায় থাকে স্ত্রীপুরুষের মিলনের ভিতর দিয়ে। মনুষ্যেতর প্রাণী থেকে মানুষের বিবর্ত্তন খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা Homosapiens পৌঁছাতে কোথায় যেন কি যোগই হারিয়ে ফেলেছেন (missing link)। এই বিবর্ত্তনের ধারায় ওরাং ওটাং শিম্পাঞ্জী ও গোরিল্লা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের এক এক ধারা। জীববিজ্ঞানীরা বা নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে গবেষণা করতে থাকুন; মানব মন সৃষ্টির মত পরম বিস্ময়কর রহস্যের নাগাল কি তাঁরা কোন দিন খুঁজে পাবেন? যে মন দিয়ে আমরা অনন্তের ভাবনা করতে পারি, বিরাট বিশ্বের রহস্য উদ্‌ঘাটনের কথা চিন্তা করছি এবং সেই রহস্য অনুসন্ধানের পথে যা আমাদের ব্রহ্মচিন্তায় নিয়ে পৌঁছে দিয়েছে? পাশ্চাত্যের কবি এইসব চিন্তার ধারে কাছে গিয়ে আমাদের এই বিশ্বে অক্সিজিৎকরণের কথা ভেবে নিরাশ হ'য়ে বলেছেন, "Can man, weak man, the glory of the Great Creator know?" (Byron, Oriental tales). আমাদের ঋষিরা কিন্তু মানুষকে দুর্ব্বল হীন মনে করেন নি। পরাজ্ঞানের অধিকারী হয়ে মানুষকে অমৃতের পুত্র বলে সম্বোধন করেছিলেন। ব্রহ্মদর্শন লাভ ক'রে পরানন্দে তাঁরা বিশ্ববাসীকে অমৃতের আস্বাদ বিলাতে গেয়ে উঠলেন—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" (শ্বেতাশ্বতর ২।৫)

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

(শ্বেতাশ্বতর ৩।৮)

ব্রহ্মোপলব্ধির পর তাঁরা জোরের সঙ্গে বললেন, আঁধার পেরিয়ে আদিত্যবর্ণ তামস জ্যোতির্ম্ময় সেই মহান পুরুষকে জেনেছি। তাঁকে জানলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়—তাঁকে জানা ছাড়া অন্য পথ নেই। সৃষ্টির নিয়মে স্রষ্টার অনুসন্ধান না করলে, স্থূল থেকে সূক্ষ্মের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত না করলে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের সীমা ছাড়িয়ে অতীন্দ্রিয় জগতে প্রবেশ না করলে এ পরাজ্ঞানের আশা বৃথা। জড়বিজ্ঞানীরা কোন দিনই সে পথের

সন্ধান দিতে পারবেন না। ঋক্ যজু সাম্ অথর্বের কর্মকাণ্ড পেরিয়ে আমাদের ঋষিরা যেখানে পৌঁছে-ছিলেন, বহু সাধনার পথ বেয়ে যেখানে গিয়েছিলেন তাঁরা, "যতশ্চিমং যমমুতোপু চ.বন্ধি'ন্নো কা নিহিতা লোকিনশ্চ।" বিভিন্ন উপনিষদে তাঁরা নানাভাবে তাঁর পথের সন্ধান রেখে গেছেন ; আর সব উপনিষদের সার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সে পথের সন্ধান রেখে গেছেন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। বেদবিভাগ কর্তা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন সূত্রাকারে সেই তথ্য গেঁথে দিয়ে গেছেন ব্রহ্মসূত্রে, যাকে বেদান্তদর্শন বলা হয়। উপনিষদ্, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও ব্রহ্মসূত্র এই তিনটি আমাদের 'প্রস্থানত্রয়'—যথাক্রমে শ্রুতি প্রস্থান, স্মৃতি প্রস্থান ও ন্যায় প্রস্থান (বা তর্কপ্রস্থান)। সনাতন ধর্ম এদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মত পথের বিভিন্নতা থাকলেও পরবর্তী আচার্যগণ কেউই এ'দের অতিক্রম করে ব্রহ্মনির্দেশ দিতে পারেন নি। এটাই গন্তব্য।

ওম্ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দিনের শেষে

কবিকঙ্কন হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার বেলা যে যায়
আমি কারে যা শুধাই
কোথায় আমার সেই
নিত্য নিকেতন।

পথে তো চলেনা কেহ
অজানা পথের মাঝে,
শুধু কি চলাই মোর
হবে নিবেদন ?

কোথায় আমার সেই
শেষ দিবসের বেলাধানি
যারে আমি যেচেছি ভাল
দিয়েছি বেদন।

দুঃখ মোর ছিল জানি
প্রাণের গভীরে ছিল ভাষা,
আজীবন টেনেছি তারে,
দিয়ে কত আশা।

বিফল হয়নি তাহা মানি
পাওয়া আসার মাঝে দেখি,
মুক-মালা মেলে
দেখি ভাষা ভাষা।

আমার ঠাকুর সেইজন
তাঁর মনে ছিল ভালবাসা।
আমাকে দিয়েছে কাঁদা হাসা,
সেই তো মোর আশা।

সন্ধ্যা নামে চারিদিকে
জোনাকিও জ্বলে থাকে থাকে
ফুটন্ত মাতাবি ফুল ঝরে,
যেন কার হাতছানি পাই।

তাই বেলা শেষে আমি
চুপি চুপি যেতে চাই সেথা
যেথা মোর রিক্ত ঠাঁই
তাই তারি গান গাই।

ওধারে চাঁদের আলো দেখি
এ ধারে সূর্যের দীপ জ্বলে
মন অন্ধকার পথে
হাতছানি দেখি তাই।

—:০:—

জয় ঠাকুর

মণিমন্দির আশ্বিন, ১৩৮১

মানিক্যবাচ্‌করের অলৌকিক জীবন-কথা

মানিকবনের প্রিয় সাথীরা,

বেদব্যাসক মহাবরের বালালীলা কথা আমাদের চলছে, চলবে। কিন্তু পূজোর সময় দুর্গতিনাশিনী মা দুর্গার কথা হলেই যেন ভাল হয়। দেবী দুর্গার কথা অবশ্য তোমাদের অনেকবার বলেছি। ভাবছি, অন্য আর কিছু বলা যায় কিনা। এমন সময় শ্রীঅর্চনা মায়ের একটা আগমনী গানের কয়েকটা কলি মনের মধ্যে গুনগুনিয়ে উঠল। তাতে শ্রীঅর্চনা মা মার কাছে আব্দার করছেন— "শিবকে ফেলে আসিস না মা / তাকেও মোরা চাই / মধুর হর গৌরী রূপে/ভাঙবে ভুবন চাই।" দুর্গাপূজোয় আমরা মা দুর্গাকে পাই, তাঁর ছেলেপিলে, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক গণেশ, সকলকে পাই কিন্তু দুর্গাপতি শিবকে তো পাই না। গানের মধ্য দিয়ে অর্চনা মা তো বেশ মজার আব্দার করেছেন মার কাছে। একথা ভাবতেই মনে হল— ঠিক আছে এবার পূজোয় তোমাদের শিবকে নিয়েই যাই'ক কিছু ব'লব। দক্ষিণ ভারতের এক শিবভক্ত শৈব সাধকের অলৌকিক জীবন-কথাই তোমাদের কাছে হ'ক এবার বড় মধুরের পূজোর উপহার।

যে শৈব সাধক মহাপুরুষের কথা বলছি তাঁর আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। ঐতিহাসিকরা কেউ বলেন, ৪র্থ খ্রীষ্টাব্দ, কেউ ৭ম খৃঃ। তাঁর বংশ বিবরণী যা পাওয়া গেছে তাতে জানা যায়, তাঁর পূর্ব পুরুষরা ব্রাহ্মণ ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের মাদুরাই-এর কাছে বৈগাই নদীর ধারে তিরুভাদবুরে ছিল তাঁদের বাস। পাণ্ডা রাজাদের মন্ত্রীর পদে ছিল তাঁদের বংশগত অধিকার। এই ব্রাহ্মণ বংশে তিরুভাদবুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন সিদ্ধ সাধক-কবি নায়নার মানিক্যবাচ্‌কর। তামিল ভাষায় নায়নার কথার অর্থ হ'ল "সিদ্ধ শৈব সন্ন্যাসী"। এ নাম তাঁর পিতামাতার দেওয়া নাম নয়। পিতামাতা মানিক্যবাচ্‌করের পবিত্র জন্মস্থানের স্মরণে নাম রেখেছিলেন তিরুভাদবুরার।

ঠিক শঙ্করাচার্যের মত অতি ছোটবেলা থেকেই তিরুভাদবুরারের মধ্যে অসাধারণ প্রতিভার স্ফুরণ ও জ্ঞানের স্পৃহা দেখা যায়। ভাবতে পারো, মাত্র ষোলো বছর বয়সে তিনি বেদ, আগম, পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তাঁর অসামান্য প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের কথা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। অরিমর্দন্ পাণ্ডা তখন মাদুরাই-এর রাজা। তিরুভাদবুরারের পাণ্ডিত্যের খ্যাতির কথা তাঁর কানেও পৌঁছল। রাজা তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তিরুকে দেখে, তাঁর সঙ্গে কথা বলে রাজা মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিরু রাজার গভীর স্নেহ ভালবাসার ডোরে বাঁধা পড়ে গেলেন। রাজা তিরুকে তাঁর প্রধান মন্ত্রী ক'রে নিলেন। সৌর্য্যে বীর্য্যে জ্ঞানে গুণে রাজা অরিমর্দনও কম ছিলেন না। দেশের লোক তাঁকে জানে, তার ও দরার অবতার বলে মান্য ক'রতো। সর্বগুণান্বিত তিরুকে পেয়ে অরিমর্দন রাজ্যের শাসন ভার পুরোপুরি তাঁর ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন।

এতদিন তিরুর জীবনযাত্রা ছিল অতি সাধারণ। এখন এসে পড়লেন রাজকীয় ভোগ-বিলাস ও প্রাচুর্যের পরিবেশে। কিছুদিনের মধ্যেই তিরু উপলব্ধি করলেন—এই বিলাস ব্যসন, এই ভোগসুখ সবই দুদিনের, ক্ষণিকের—এতে যথার্থ শান্তি নেই, আনন্দ নেই। আপাতিক ভোগ সুখের ব্যাপারে তিরুর মনে জাগল দারুণ বিতৃষ্ণা। অন্তরে জ্বলে উঠল তীব্র বৈরাগ্যের আগুন, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। দক্ষিণ ভারতে শৈবদের কাছে

"শমঃ শিবায়" এই পঞ্চাক্ষরী শিব-মন্ত্র সংসার বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের মহামন্ত্র। ব্রাহ্মণ ভিক্ষু এই মুক্তি মন্ত্রের রহস্য জানার জন্য আকুল হলেন। মুক্তির পথ বলে দিতে পারেন এমন বিদগ্ধ গুরুর জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল ভিক্ষুর অন্তরাত্মা।

এমন সময় একদিন রাজদরবারে এসে রাজা শুনলেন বিদেশ থেকে কতকগুলি জাহাজ বোঝাই হ'য়ে বহু দামী দামী ঘোড়া এসেছে। রাজা শুধুনি তাঁর প্রিয় পার্ষদ ভিক্ষুভাদবুরারকে প্রচুর অর্থ দিয়ে আদেশ করলেন ভিক্ষুপেরুন্দুরাই গিয়ে ঘোড়াগুলি তাড়াতাড়ি কিনে ফেলার জন্য। রাজ আদেশ মাথায় নিয়ে ভিক্ষু চললেন ভিক্ষুপেরুন্দুরাই। বুকে তাঁর সোনার জ্বলছে ব্যাকুলতার আগুন—কোথায় সেই সদ্‌গুরু যিনি মুক্তির পথ বলে দেবেন। এদিকে শিব তাঁর চিহ্নিত ভক্তকে কৃপা করার জন্য ভিক্ষুপেরুন্দুরাইতে পথের ধারে একটি বিরাট গাছের তলায় মহাজ্ঞানী ঋষির ছদ্মবেশে বসে আছেন। তাঁর পরনে তাঁর প্রমথরা অর্থাৎ অনুচররা শিষ্যের রূপ ধরে বসে রয়েছেন। ভিক্ষু তাঁর অজান্তেই ভিক্ষুপেরুন্দুরাই-এর ঐ গাছ তলায় এসে উপস্থিত হলেন। সোজাসুজি ঋষিকে দর্শন করে তিনি আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠলেন। ভুলে গেলেন রাজ-আদেশ, রাজ-কার্যের কথা। তাড়াতাড়ি রথ থেকে নেমে ঋষির চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করলেন। তাঁকেই গুরু রূপে বরণ ক'রে প্রার্থনা জানালেন, "প্রভু, কৃপা ক'রে আমাকে আপনার শিষ্য ক'রে নিন। এই অনিত্য সংসার বন্ধন থেকে আমাকে মুক্ত ক'রে দিন। মুক্তিলাভের সেই মহামন্ত্র আমায় কৃপা ক'রে দান করুন।" শিব তো ভিক্ষুকে কৃপা করার জন্যই বসে ছিলেন। ভিক্ষুর আন্তরিক ব্যাকুলতায় তিনি খুব প্রীত হলেন। ভিক্ষুকে পরাজ্ঞান দান ক'রে নিজের স্বরূপ ব্যক্ত ক'রে অন্তর্হিত হলেন।

ভিক্ষু সেই থেকে তাঁর আরাধ্য দেবতা শিবের স্তুতি গাইতে শুরু করেন। শিব দেখলেন ভিক্ষুর এই অপূর্ব প্রশস্তিগুলির তাবৎগুলি বহু মূল্য মানিক্যের (রত্ন) দ্যুতির মতই পবিত্রোজ্জ্বল। শিব খুব খুশী হয়ে ভিক্ষুর নাম দিলেন "মানিক্যবাচকর" অর্থাৎ বাণীগুলি যার মনির মত দিব্যোজ্জ্বল। মানিক্যবাচকর তখন ঘোড়া কেনার জন্য রাজার দেওয়া টাকাগুলি সবই গুরুদক্ষিণা স্বরূপ গুরুর চরণে সমর্পণ করলেন। সেই টাকাতেই ভিক্ষু-পেরুন্দুরাই-এর মন্দির তৈরী হয়েছিল।

এদিকে রাজা যখন জানতে পারলেন তাঁর প্রিয় পার্ষদ শৈব সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন, তিনি তখন মানিক্য-বাচকরকে ঘোড়াগুলি পাঠিয়ে দেবার জন্য আদেশ পাঠালেন। মানিক্যবাচকর রাজার আদেশের কথা শিবকে জানালেন। শিবের আদেশে মানিক্যবাচকর রাজাকে গিয়ে ব'লে এলেন, "মহারাজ, আপনি চিন্তা করবেন না, কিছুদিনের মধ্যেই ঘোড়াগুলি আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব।" কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঘোড়াগুলি এল না দেখে রাজা মানিক্যবাচকরের কাছে টাকা ফেরত চেয়ে পাঠালেন। অত টাকা যিনি সন্ন্যাসী মানিক্যবাচকর কোথায় পাবেন? টাকা ফেরত দিতে পারলেন না। রাজা তাঁকে কারাগারে বন্দী ক'রে রাখার আদেশ দিলেন। কারাগারে বন্দী থেকে মানিক্যবাচকর শিবের কাছে আকুল হয়ে প্রার্থনা জানালেন। শিব ভক্তের প্রার্থনায় ব্যাকুল হয়ে ওখানকার জঙ্গলে যত শিয়াল ছিল তাদের ঘোড়ায় রূপান্তরিত করে রাজার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ঘোড়া পেয়ে রাজা মানিক্যবাচকরকে কারাগার থেকে মুক্ত করে দিলেন। এদিকে মজা হ'ল কি, ঘোড়াগুলি সেই রাত্রেই স্ব স্বরূপ ফিরে পেল অর্থাৎ আবার শিয়াল হয়ে গেল। সহরবাসীদের ঘরে ঘরে ঢুকে তারা খুব উপদ্রব সুরু করে দিল। রাজা মানিক্যবাচকরের আরাধ্য দেবতা শিবের অলৌকিক লীলার মর্ম কিছু উপলব্ধি করতে পারলেন না, তিনি মনে করলেন মানিক্যবাচকর তাঁকে ঠকিয়েছে। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে টাকা ফেরত দেবার জন্য আদেশ পাঠালেন। মানিক্যবাচকর আবার বিপদে পড়লেন। টাকা ফেরত দেবার তাঁর তো কোন সঙ্গতি

নেই। তিনি বুক নিঙড়ে তাঁর দেবতার চরণেই আবার জানালেন কাতর প্রার্থনা। রাজার আচরণে শিব খুব কষ্ট হ'লেন। তিনি বৈগাই নদীতে বন্যা সৃষ্টি ক'রে মাদুরাই সহর ভাসিয়ে দেবার উপক্রম করলেন। ভয়াবহ বন্যার তোড়ে রাজা ধ্বংসের মুখে দেখে রাজা দারুণ ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি এখন বুঝলেন এ মহাবিপদ মাণিক্যবাচকরের দেবতা শিবেরই রোষের ফলে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মাণিক্যবাচকরকে টাকা ফেরত দেবার দায় থেকেও মুক্তি দিয়ে নিজে বিপদ-মুক্ত হলেন।

মাণিক্যবাচকর এবার চিরকালের মত প্রধান মন্ত্রীর পদ ত্যাগ ক'রে তিরুপেরুন্থুরাইতে চলে এলেন। এখানে এসে তিনি শিবের ধ্যান ধারণা নিয়ে থাকেন আর আমাদের দেশের সাধক রামপ্রসাদের মত শিবের গান রচনা ক'রে শিবকে গেয়ে শোনান। এরপর একদিন শিবের আদেশে ভারতের পবিত্র তীর্থস্থানগুলি দর্শন করতে বেরিয়ে পড়েন। বহু তীর্থ দর্শন ক'রে শেষে চিদম্বরমে এসে উপস্থিত হলেন। চিদম্বরম তামিলনাড়ু প্রদেশের দক্ষিণ আরকট জেলায় এক মহাতীর্থ। এখানকার নটরাজ শিবের মন্দির ভারত-বিখ্যাত। এখানে এসে তিনি নটরাজের পূজো করেন আর মনের আনন্দে নটরাজের প্রশস্তি রচনা ক'রে গেয়ে শোনান নটরাজকে। এই চিদম্বরমে ভারতের অন্যান্য ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটল। সিংহল থেকে একদল বৌদ্ধ ধর্মযাজক এসেছিলেন চিদম্বরমে শৈব ধর্ম উচ্ছেদ ক'রে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে। মাণিক্যবাচকর হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব এবং বিশেষ ক'রে শৈবধর্ম বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে তর্ক যুদ্ধে নামলেন। মাণিক্যবাচকরের জ্ঞানসিদ্ধ অকাট্য যুক্তির কাছে তাঁরা টিকতে পারলেন না। দারুণভাবে হেরে গেলেন। শুধু তাই নয়, শিবকৃপায় মাণিক্যবাচকরের অলৌকিক শক্তি প্রভাবে সিংহলের বৌদ্ধ রাজার বোবা মেয়ের মুখে ফুটে উঠল কথা। এইসব দেখে শুনে বৌদ্ধ-যাজকদের মাথা হেঁট হয়ে গেল। তাঁরা বৌদ্ধ ভেক ত্যাগ ক'রে সারা অঙ্গে হোমের পবিত্র ভস্ম মেখে চিদম্বরমে নটরাজের মন্দির এলাকার এক প্রান্তে থেকে গেলেন। এই ঐতিহাসিক ঘটনার স্মরণেই চিদম্বরম মন্দিরে মাণিক্যবাচকরের বিজয়গাথা আজও গাওয়া হয়।

চিদম্বরমে মাণিক্যবাচকরের পবিত্র জীবনে এরপর নটরাজের আর এক অলৌকিক লীলা ঘটল। নটরাজ একদিন ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে মাণিক্যবাচকরের কাছে এসে বললেন, তুমি এ পর্যন্ত যত গান গেয়েছ আমি সেগুলো নব লেখবার জন্য তোমার কাছে এসেছি। তুমি গানগুলি ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে আমাকে বল, টুকে নেব। মুনিবর বলতে সুরু করলেন। ব্রাহ্মণরূপী নটরাজ তাঁর খাতায় সব টুকে নিলেন, শেষে খাতায় নিজের নাম সই ক'রে চলে গেলেন। তাঁকে আর কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না। পরদিন সকালে মন্দিরের চৌকাঠের ওপর একখানা সুন্দর খাতা পড়ে আছে দেখা গেল। এ সেই খাতা শিব যাতে ব্রাহ্মণের রূপ ধরে স্বহস্তে মাণিক্যবাচকরের গানগুলি লিখে নিজের নাম স্বাক্ষর ক'রে গেছেন। এক হাজারটি গান—মুক্তাক্ষরে নির্ভুল লেখা—এতটুকু ভুল ত্রুটি নেই কোথাও। ব্রাহ্মণ ভক্তরা খাতাখানি ভক্তিভরে তুলে নিয়ে মাণিক্যবাচকরের কাছে গেলেন। খাতাটি তাঁকে দেখালেন। তাঁরা গানগুলির মর্মার্থ জানতে চাইলেন মাণিক্যবাচকরের কাছে। খাতাটি হাতে নিয়ে মাণিক্যবাচকর তাতে নটরাজের স্বহস্তে লেখা নিজের গানগুলি ও নটরাজের স্বাক্ষর দেখে আনন্দে ভাবে অভিভূত হয়ে গেলেন। তাঁর প্রতি নটরাজের অপার কৃপা করুণার কথা স্মরণ ক'রে তাঁর দু চোখ বেয়ে তখন নেমেছে অশ্রুর ধারা। যাইহোক মাণিক্যবাচকর ব্রাহ্মণদের অনুরোধের উত্তরে বললেন,—"আপনারা আসুন আমার সঙ্গে"। তিনি ব্রাহ্মণদের নিয়ে নটরাজের মন্দিরে এলেন। মন্দিরে প্রবেশ করে নটরাজকে দেখিয়ে বললেন—গানগুলির অর্থ জিজ্ঞাসা করছেন আপনারা? এর অর্থ স্বয়ং আমার প্রভু, প্রভু নটরাজ। এই কথা বলতে বলতে সকলের চোখের সামনে শিবভক্ত মাণিক্যবাচকর নটরাজের অঙ্গে চিরলীন হয়ে গেলেন। শিব-

ভক্তের এই ভবিষ্যরূপীর লীলা দর্শন করে সকলে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে করতে নটরাজ ও মানিকাবাচকরের জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন।

চিদম্বরম মন্দিরের চারটি গোপুরম অর্থাৎ প্রবেশ তোরণের মধ্যে প্রধান গোপুরমটির নাম মানিকাবাচকরের গোপুরম। তীর্থ যাত্রীরা এই প্রবেশ পথ দিয়ে নটরাজকে দর্শন করতে যাবার সময় মানিকাবাচকর ও নটরাজের অপূর্ব লীলা কথা স্মরণ করতে করতে আনন্দ পুলকিত মনে মন্দিরে প্রবেশ করে। শঙ্করাচার্যের মতই মহাজ্ঞানী শিব শৈব সাধক মানিকাবাচকর মাত্র ৩২ বছর বিলেন ধরাধামে। তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য সঙ্কলনের নাম 'তিরুবাচকম্' যার বাংলা অর্থ অমৃত বাণী। তামিল ভাষার এটি একটি বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থ। এই কাব্যগ্রন্থ এত প্রাণস্পর্শী যে, গ্রন্থটি নিয়ে একটি প্রবাদ বাক্য সৃষ্টি হয়ে গেছে—"তিরুবাচকম্ হৃদয় গলাতে না পারলে আর কোন কিছুতেই তা সম্ভব নয়।"

শারদীয়া পূজার শুভ লগ্নে মার কাছে আমাদের ভাই প্রার্থনা—মা তোমার কৃপা তো চাই-ই সেই সঙ্গে যেন শিবের কৃপাটিও পাই—তবেই আমাদের জীবনে সত্য শিব সুন্দরের হবে প্রকাশ। ইতি—　　তোমাদের
বড় মহুয়া

সাহায্যকারী গ্রন্থ : "Manikya Vachakar" by Le Ka (Bhavan's Journal, July, 13, 1969) এবং "মহাভূত মহাতীর্থ"—শ্রীমতী সুনন্দা ঘোষ (উদ্বোধন, শ্রাবণ, ১৩৮৯)।

—:০:—

অপাবৃণু

সুরেন্দ্রনাথ দেব

"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥"

ঈশ—১৫

বৈদিক প্রভাতে—
　　আমাদের আর্য, পূজ্য পিতারা
　　সূর্যের বন্দনা-ব্রতী মন্ত্রে মননে।

সত্যের পুরোধা প্রতীক, জাগ্রত সত্তার প্রেরক,
প্রবিদ্যা, ব্যাপ্তির বিরাট প্রতিভূ,
ক্লান্তিহীন চলিষ্ণু জ্ঞেয়ের পথিক—
স্বপ্রকাশ, সুতরাং নিখিল-প্রকাশী
　　সূর্য সেদিন
　　ঋতবান্ আর্য সমাজে
　　নিত্য-উপাসিত

জীবনের সর্বতো-ভদ্র শক্তি ও বিভবের
প্রদায়ক রূপে।

সেই সূর্য আদি অকৃত্রিম
　　পূর্বাশায় আজও সমুদিত—
পূরাতন, তবু চির-নূতনের দূত—
　　চিরন্তন বিস্ময় ভাস্বর।

অন্তগত পূর্বাবেশে যে সূর্য শোভন—
সেও তো প্রাচীন-ঋষি-কবি-কুলার্চিত।

আজিকার নীল নভস্তল,
যাজ্ঞিকের-চোখে-দেখা অটল আকাশ—
সব মেলে। তবু যেন গরমিল কোথা।
প্রত্যূষে উঠিয়াও কম্বুকণ্ঠে উদাত্ত উদ্বোধে
দেবতার আবাহন
বিভু অন্তরীক্ষে, ব্যোমে প্রতিধ্বনি তোলে—
সূর্য-সাক্ষী জীবনের অক্লান্ত প্রয়াসে
অমৃতের অভীপ্সায়
'চরৈবেতি' পথে
শ্রীময় যীশু-ভদ্র
সূর্য দৃষ্টান্ত।
ভাবি আজ—
সে-প্রভাত কতো-কতো দূরে।

সায়ন্তন আমাদের
আলো-ছায়া-সন্ধ্যা-ভাষা-জটিল জীবনে
জীবনের অর্থ খুঁজি
চন্দ্রিকায়, রাত্রির গভীরে—
অথবা, আষোঘে চেয়ে অন্ধকার,
রোশনাই এবং উচ্চ-শব্দ সমারোহে।
সূর্যের ভীষণ তেজ, সত্যেরও তাই।
অতএব, সম্প্রতি, আমাদের মুখ
তার থেকে প্রায় পরাঙ্মুখ।
যাচাইকে বড্ড ভয়। তাই,—
যে পথে অভিজ্ঞ হোত জীবনের গুঢ়-সম্ভার
সভ্যতার অর্বাচীন বর্ষের প্রভাবে
সদর্পে আজ তার বিপরীতে চলি।
অপরের জীবনের উজল কেড়ে—
চুরি ক'রে আর কারো আলো—
হামেশাই নিজগৃহে দীপাবলী জ্বালি।
খোলা চোখে সূর্য আজ
শুধু চন্দ্রঃসূদ।

মাইকের মহানাদ, প্রচারের বিশ্বরূপ,
জনসায় জনের কৃষ্টিতে
গোটা দেশ আজন্ন আবিল।
এ সময়ে যদি শুনি 'প্রণম প্রভাত',
যদি শুনি 'সৌর উপাসনা'—
চকিত বিস্ময়ে মৌন কণ্ঠাগ্র হয়।

• • •

পুরাতন সে-সূর্যের মতো
সত্যজীর সূর্যের কিরণ-তিক্ষুরা
আমও কিন্তু বিশ্বস্ত সত্তায়
এখানে সেখানে কিছু সঞ্জীবিত আছে।
সুতরাং মুক্তাঙ্গনে, আনাচে কানাচে,
আজ এই পঁচিশে বৈশাখে
প্রভাত সূর্যের কাছে
প্রার্থনায় নম্র হয়
মূঢ়ন জিজ্ঞাসু।
ঐকান্তিক মুমুক্ষার অপরূপ বাঙ্ময় রূপ—
পুরা-শ্রুত মন্ত্র পুনঃ উচ্চারিত হয়—
[হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্ অপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।]
শুধু রূপ দিয়ে সত্য ঢেকো না,
আবরণ করো অপাবৃত,
হ্যুতিমান্ হে সৌর পুরুষ।
সুবর্ণ-বিদারিত সত্যকে এবার
সত্য-স্বরূপে চাই
অনাময় দৃষ্টিতে আমার।
সরাও আড়াল, হে দেবতা,
হে শোভন সত্য-ধারক,
নিরুদ্ধ পূরণ করো,
সত্য-তীর্থে প্রবেশের দ্বারপথে
অবিলম্বে কৃপা ক'রে,
কৃপা ক'রে করো তুমি
সালোক্য সাক্ষর।

—:০:—

দিলীপকুমার রায়ের চিঠি

[এই চিঠিগুলি মহারাষ্ট্রের পুনা থেকে কানপুর নিবাসী শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ চক্রবর্তীকে লেখেন। শ্রীচক্রবর্তী ১৩ বছর যাবৎ ওয়াইতে D. V. (P. G.) College-এ ইংরেজীর অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন। পূজ্যপাদ দিলীপ রায়ের তিনি বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী ভারতবর্ষে প্রকাশিত তাঁর সারগর্ভ বহু বাংলা ও ইংরেজী প্রবন্ধের মাধ্যমে ভারতবর্ষের পাঠকবর্গের বিশেষ পরিচিত। শ্রীদিলীপ রায়ের চিঠিগুলি তিনিই ভারতবর্ষের পাঠককে দিয়েছেন উপহার। —সম্পাদক]

Dilip Kumar Roy

Telephone No. 57387
INDIRA NILOY
Hari Krishna Mandir
Hari Krishna Mandir Road,
Poona-16
৩০ ভাদ্র

ওঁ
১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭

কল্যাণীয়েষু

তোমাকে ওয়াই-এর ঠিকানাতেই লিখছি কারণ এ চিঠি ১৮ই-এর মধ্যে কানপুরে পৌঁছত না। তোমার ভাইয়ের অসুখের খবরে দুঃখিত হলাম। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি যে নিরাময় হোক। তুমি 'যুগবাণী শ্রীঅরবিন্দের' জন্যে ১০'০০ টাকা না পাঠালেও চলবে।

তোমার কথা আমি ভুলিনি। তবে নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় ব'লে তোমাকে চিঠি লিখতে পারিনি অনেকদিন। তাছাড়া আমার চোখে Cataract operation করার কথা ভাবছি। পড়তে লিখতে আজকাল বেগ পেতে হয়। তবে কাজ চ'লে যায় এখনো। ডাক্তারে বলেছে ভাবনার কোন কারণ নেই। দু মাস চোখের ব্যবহার চলবে না যদি কাটাই। তাই মনস্থির করতে পারছি না।

সংসারে অসুখ-বিসুখ আছেই। সবাইকেই যেতে হয় এর মধ্যে দিয়ে। তবে ভগবানে বিশ্বাস থাকলে অসুখবিসুখের মধ্যে দিয়ে তাঁর কাছে এগুতে পারা যায় এই যা বাঁচোয়া। ইন্দিরাও হাঁপানিতে কষ্ট পাচ্ছে খুবই—দৈহিক কষ্ট। তবে ওর মনের জোর অসাধারণ। আশ্রমের সব কাজই ক'রে যাচ্ছে। তোমাকে গত গুরুপূর্ণিমার বিবরণ পাঠালাম। তুমি কি ইংরেজি পড়তে পারো? তাহ'লে তাকে পাঠিয়ে দিও।

তোমরা আমার স্নেহাশিস নিও। বীসিস করছো এখনো? ইতি।

তোমাদের নিত্যাশীর্বাদক—দিলীপদা

ওঁ

৭. ১০. ৬৭

কল্যাণীয়েষু

অত দুঃখিত হোয়ো না। আমাকে বলায় তোমার কোনো অপরাধ হয়নি। আমি চেয়েছিলাম শুধু বলতে যে এ-জগতে দুঃখের দুর্দিনে আরো মনে রাখা ভালো যে, ঠাকুর শুধু দুঃখই দেননি আমাদের, সুখও দিয়েছেন অঢেল। অর্থাৎ দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক থাকলে দুঃখ সওয়া সহজ হ'য়ে আসে। আজকের দিনে বিশ্বব্যাপী হিংসাদ্বেষের যে রূপসজ্জা দেখছি অমনুষ্যত্ব মানুষের সংঘবদ্ধ অত্যাচারে তাতে মন কার না ভিজে হয়। কার না মনে হয় কবি ওয়ার্ডসবর্থের ভাষায় : "What man has made of man".

তোমাকে আমি সুশীল সদাশয় বিনয়ী যুবক ব'লে প্রথম দিকেই চিনেছি আর তাই তো এত স্নেহ করেছি। তুমি রিসার্চ ছেড়ো না। এ বইটির জন্যে আমি লিখে দিচ্ছি আমেরিকায়।

আমাদেরও এই দুঃখের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়।

জন্মাষ্টমীর রাতে ইন্দিরার যে-ভাবে ৩।৬ বার heart attack হয় তাতে মনে হয়েছিল বুঝি touch and go —হাঁপানি ওর লেগেই আছে—তার ওপরে আরম্ভে নানা দুর্বিষহ অসৎ লোকের নানা উপদ্রব—সে ব'লে শেষ করা যায় না। তবু এ সবই আমাদের পরীক্ষা ব'লেও নিজেকে মানিয়ে নিয়েছি। জন্মাষ্টমীতে তবু কী আনন্দেরই বান ডেকে গেল যদি দেখতে—ওর অসুখ সত্ত্বেও? একটা বিবৃতি পাঠালাম। প'ড়ে ফেরৎ দিও। যদি রাখতে চাও তো কাউকে দিয়ে টাইপ করিয়ে নিও কপি আমাকে পাঠিও, কারণ আমি যে মিশ কপি cyclostyle করিয়ে এনেছিলাম প্রায় নিঃশেষ।

যুগঋষি অরবিন্দে তাঁর প্রেমী রূপটি মন দিয়ে পোড়ো সংসারে সব চেয়ে বড় দান বিধাতার—প্রেম প্রীতি স্নেহ। যাঁরা যত মানুষকে ভালোবাসতে পারেন তাঁরাই তত বরেণ্য এই-ই আমি সার জ্ঞান জেনেছি। নিজের কথা না ভেবে পরের কথা ভাবা—এই-ই সুখের শ্রেষ্ঠ পন্থা।

মাঝে মাঝে তোমার খবর পেলে সুখী হব। ইতি।

তোমার নিত্যাশীর্বাদক—

দিলীপদা

৬

১ ফাল্গুন, ১৩৭৪ ইং ২২. ২, ৬৮

কল্যাণীয়েষু

তোমাকে লিখব লিখব ক'রে দেখ কত দেরি হ'য়ে গেল। ইন্দিরার মীরাভজন অনুবাদ করেছি ইংরেজিতে সভাষিক। তাছাড়া তার সমাধির নানা উপলব্ধির কাহিনী—সবশুদ্ধ আড়াই শো পাতার বই-এর পাণ্ডুলিপি করতে কি যে খাটতে হ'ল। আজ পৃষ্ঠা দেওয়া শেষ হ'ল। তাই এখন একটু ফুর্সৎ মিলল অবলেষে। এসব কাজ নিজের গরজে করা তো তাই শেষ না হ'লে অন্য-দিকে মন দিতে পারি না বললে অত্যুক্তি হবে না বোধহয়।

কিন্তু তাই ব'লে তোমার কথা আমি ভুলিনি। তোমার শ্রদ্ধা বিনম্র শালীনতা আমার খুবই ভালো লাগে। তাই তো আমি চেয়েছিলাম তুমি গবেষণা ক'রে ডাক্তার হও। বইও পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি যে বইটি কের চাইলে সেটি মিউয়র্কে একান্ত (Richard) খোঁজ করেও পায়নি। অত একটা বই পাঠিয়েছে লিখেছে, কিন্তু সে বই এখনো পৌঁছায়নি। পৌঁছালে যদি তোমার কাছে নাগে পাঠিয়ে দেব। ০০০০০০ যাহোক তুমি যেন পথের বাধা জয় ক'রে এগিয়ে যেতে পারো এই প্রার্থনা করি।

ওরাই থেকে কে এক ভদ্রলোক তোমার কাছ থেকে আমার ঠিকানা পেয়ে পাহাড়প্রমাণ চিঠির পর চিঠি লিখে চলেছেন। ভদ্রলোক অবশ্য রে যাবেন লিখেছেন। কে এক "পতিতা রমণী"র 'পরে তাঁর অপার অনুরাগ। তাকে আমার কাছে পাঠাতে চেয়েছিলেন। সে আসেনি। বোধহয় সে টের পেয়েছিল তার শুভার্থীর মস্তিষ্কের অবস্থা। ইনি কে হে? মাথা খারাপ হ'ল কবে? কী ভক্তে? জানো কি?.....তাঁর নাম।

নতুন বইটির নাম ইন্দিরাই দিয়েছে :

When the Flute Calls

তার উৎসর্গ পাঠালাম। আমার এক বিদ্বান ও আদর্শবাদী গুরুভাই রজনীকান্ত মোদী—পরম বন্ধু। তাঁকেই উৎসর্গ করেছি। পড়লে ব্যাপারটা খানিকটা এঁচে নিতে পারবে তাই পাঠালাম।

আমার Yogi Sri Krishnaprem বইটি তোমায় পাঠিয়েছি। প্রাপ্তি সংবাদ দিও।

আজ একটু বিরক্তে যাচ্ছি—চোখের ছানি না কাটালে বোধহয় আর চলবে না। দেখা যাক কবে কাটানো হয়। তোমার খবর দিও। নিরুৎসাহ হোয়ো না। ঠাকুর যখন আছেন নির্ভরসা কেন হবে? আমাদের স্নেহাশীষ নিও।

ইতি। তোমার নিত্যাশীর্বাদক

দিলীপদা

৪

1. 3, 68

শৈলেন,

তুমি ও জন্যে ভেবো না। অনেক পাগলই আমাকে চিঠি লেখে। • কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে : তোমাকে Yogi Sri Krishnaprem পাঠিয়েছি অনেক দিন হ'ল। পাওনি কি? ইতি।

তোমার নিত্যাশীর্বাদক
দিলীপদা

• এই চিঠিটি পোস্টকার্ডে লেখা। আগের চিঠিতে যে ভদ্রলোকের পাগলামি ভরা চিঠির উল্লেখ করেছেন এখানে সেই প্রসঙ্গে শৈলেন্দ্রনাথকে উনি আরম্ভ ক'রে ওই কথাগুলি লেখেন। —সম্পাদক, 'ভাবমুখে'

৫

কল্যাণীয়েষু,

তোমাকে সকালে একটি পোস্টকার্ড লিখে ডাকে দেওয়ার ঠিক পরেই তোমার ১৬ টাকা মণি-অর্ডার এসে হাজির। আমি তোমাকে বইটি উপহারই পাঠিয়ে-ছিলাম। তা হোক। আশ্রমে তোমার কথা স্মরণ ক'রে প্রসাদ বিতরণ করব ভজনের পরে। অনেকেই আমাদের প্রণামী পাঠান তো।

সঙ্গে একটির কপি পাঠালাম। এর একটি কপি ক'রে পাঠাবে তোমার পত্রাঙ্কারে?

আজ আর সময় নেই।

চক্ষে ছানি পড়েছে। তবে তোমার পত্রাঙ্কর পড়তে এখনো বেগ পেতে হয় না।

আমার স্নেহাশীষ নিও।

—৬—

তুমি যে শীতল জল

অপর বুড়ো

বুক ফাটা এই দারুণ তৃষায়
তুমি যে শীতল জল,
দেহে মনে জাগে অগ্নির জ্বালা
তুমি প্রাণে সুশীতল।
চন্দনে তুমি পরশ বুলাও
কৃষ্ণ মেঘের পানখানি খাও
তব উজ্জ্বল কলকল ধ্বনি
শুনি আমি অবিরল,
বুক ফাটা এই দারুণ তৃষায়
তুমি যে শীতল জল।

সারা বিশ্বের কোথাও যখন
নাই একটুকু হায়া
তোমার বুকের শীতল ও নীড়ে
বিরাজ মধুর মায়া।
নদী-সরোবর যবে বারি-হীন
মরণ-গানে নাচো রাত্ত দিন
পরম দহনে শীতল সলিল
সিঞ্চনে এ কী ছল—
বুক ফাটা এই দারুণ তৃষায়
তুমি যে শীতল জল।

শ্রীশ্রীমাতা আনন্দময়ী

স্বামী সচ্চিদেকানন্দ

ভারতবর্ষের সাধুসমাজের অন্যতমা শীর্ষস্থানীয়া মহিলা শ্রীশ্রীমাতা আনন্দময়ী সম্প্রতি দেহরক্ষা করেছেন। এ ক্ষতি শুধু পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের নয়, সারা বিশ্বের। সারা পৃথিবীতেই আধ্যাত্মিক জগতে তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে ছিলেন। তাঁর বহু হাজার হাজার পাশ্চাত্ত্য ভক্তেরা আজ তাঁর তিরোধানে, বিয়োগ বিধুর। আমাদের ঠাকুরের আকর্ষণে শ্রীশ্রীমাতা আনন্দময়ী কৃপা করে আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমেও এসেছিলেন। মা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বালিকাভাবে গোপালবিষ্ট চিত্তে আমাদের ঠাকুরকে গোপালভাবে আদর করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর সহজাত অসঙ্গসত্তায় একটু সংকোচ ভাব প্রকাশ করায়, মা হেসে বলেন, "বাবা সত্যের আমি একটি ছোট্ট মেয়ে"।

মা-র জীবনের অলৌকিক কীর্তি কাহিনী অনেক কিছু বহু গ্রন্থে ভক্তেরা লিখে গেছেন। কিন্তু এই দীন সেবকের সঙ্গে যে তাঁর আধ্যাত্মিক যোগাযোগ কিভাবে হয় তাও বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ; জানলে অনেকের উপকার হতে পারে বিবেচনায় সেটি এখানে নিবেদন করছি শ্রীযুক্ত কটিক মহারাজের নির্দেশে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে দীক্ষা নেবার অনেক পরের কথা। তখন ব্রহ্মচারী অবস্থা। চীন থেকে ফিরে এসে ঠাকুরপুকুরে আস্তানা গেড়েছি। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন সিউড়ী থেকে এসে সেবাশ্রমে বাস করছেন। ঐ সময় এমন একটা যোগাযোগ ঘটেছিল যে যেখানেই যাই শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাচ্ছে। দিল্লীতে গেছি সেখানে মা, এলাহাবাদে গেছি সেখানে মা, হৃষীকেশে থাকব সেখানে মা, দেরাদুনে মা, বৃন্দাবনে মা। ঠিক যে মা যেখানে গেছেন খবর পেয়ে গেছি, তা নয়; কাজের গতিকে নিজে ঘুরছি, মার দর্শনও হচ্ছে। যখনই দর্শন হচ্ছে বিহ্বল হয়ে পড়ছি—কখনও মনে হচ্ছে শ্রীমন্ মহাপ্রভু প্রেমাবেশে হরিবোল হরিবোল করছেন। কখন মনে হচ্ছে জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী জ্ঞানমুদ্রায় জ্ঞান বিজ্ঞান বিতরণ করে চলেছেন; কখনও মনে হচ্ছে মহালক্ষ্মী রূপিণী—এঁর পাদপদ্মে সর্বস্ব উজাড় করে দেওয়াতেই এ জীবনের সার্থকতা। দর্শন করে এসে যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে সেই দর্শনের কথা নিবেদন করছি আবেশ বিহ্বলভাবে, শ্রীশ্রীঠাকুর সব শুনছেন কিন্তু কোন চাঞ্চল্য নেই, মার কাছে যেতে নিষেধও করছেন না আবার যাওয়াটা যে খুব পছন্দ করছেন তাও মনে হচ্ছে না। কেবল বলছেন, "দেখ, আমরা যা দেখেছি, তাতে সমস্ত চোখ জলসে গেছে। আর কিছু ভাল লাগে না"। একবার সদ্‌গুরুর আশ্রয়লাভের পর আর কোনও মহাপুরুষকে দেখতে না যাওয়ার একটা মত সাধুসমাজে প্রচলিত আছে, পাছে ঐ মহাপুরুষের কোনও শক্তি বা বিভূতি দেখে যদি নিজের গুরুর প্রতি অশ্রদ্ধা আসে সেইজন্যই এ নিয়ম: তাই নিয়ম হচ্ছে, অন্য কোন মহাপুরুষের কাছে গেলে মনে করতে হয় নিজের গুরুই ঐ রূপ পরিগ্রহ করে বিরাজমান। তাহলে আর গুরুভক্তির হানি হয় না। কোনও বিপদ ঘটতে পারে না।

এই সময় মণিমামা (শম্ভু মহারাজ) ছিলেন, যাঁর অন্যতম বিশিষ্ট সন্ন্যাসী সেবক। কুম্ভমেলা সুরু হবে, এমন সময় একদিন মণিমামা এসে হাজির, আমাদের ঠাকুরপুকুর আশ্রমে। স্কুল চলছে। মণিমামা বললেন, "তোদের এই যে রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়, এঁদের শুধু কাজ আর কাজ। দেখ কুম্ভমেলা হচ্ছে। সারা ভারতের সব সাধুরা কত পাহাড় পর্বত পার হয়ে, কত দিকি ওঁরা থেকে এসে হাজির হবেন কুম্ভে। কারণ কুম্ভে যোগদান করা সাধু

মায়েরই অবশ্য কর্তব্য। তা তোর তো ছুটি, ছুটী নেই। তাই যেতে পারবি না। আমরা দেখ মা'য়ের ছেলে। আমরা সব চললাম কুম্ভে। তোর যাওয়া হল না।" মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। সত্যই তো এই কুম্ভে প্রতি চার বৎসর অন্তর সারা ভারতের সাধুরা একত্র হয়ে সাধুসমাজের উন্নতি অবনতির বিষয় নির্ণয় করে সাধুসমাজ তথা ভারতবর্ষকে রক্ষা করার পথ নির্দেশ দেন। কুম্ভে যোগ দেওয়া সাধুসমাজের একটা পবিত্র কর্তব্য। তা যাই সেবারতনে, শ্রীশ্রীঠাকুরের মত নিয়ে না হয় কুম্ভে ঘুরে আসি। বরাহনগরে এসে দেখি সেনকা (শ্রীরেন সেন) আমাদের আশ্রমের সাধুদের কুম্ভমেলায় যাবার জন্য কয়কগুলি টিকিট কেটে রিজার্ভেশন—শ্রীশ্রীঠাকুর জানতে পেরে খুব বকে গেছেন। বলেছেন, "সব টিকিট ফেরৎ দাও। কেউ কুম্ভে যাবে না।" যেখানে কুম্ভে যাবার টিকিট ফেরৎ যাচ্ছে, সেখানে কুম্ভে যাওয়ার অনুমতি চাওয়ার সাহস হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং আর কিছু না বলে চলে এলাম ঠাকুরপুকুরে। তারপর নানা কাজের ঠেলায় কুম্ভের কথাই আর মনে নেই। এখন চীনা ভাষার ব্যাপার নিয়ে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর সঙ্গে প্রায়ই নানা কারণে দেখা সাক্ষাৎ করতে হত। কি একটা ব্যাপারে দিল্লী যেয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে। যেহেতু তিনি প্রধান মন্ত্রী, সেইজন্য কবে কোথায় দেখা হবে সেটা দিল্লী যেয়ে তাঁর সেক্রেটারীর কাছে ফোন করে জেনে নিতে হবে। সুতরাং দিল্লীর টিকিট কেটে ট্রেনে চেপেছি। কনডাকটারকে জিজ্ঞাসা করেছি, তোর কোথায় হবে। তিনি বললেন—"এলাহাবাদে"। সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হল, "আরে কাল থেকেই তো কুম্ভ শুরু। তিন দিন কুম্ভে কাটিয়ে দিল্লী গেলেও তো ক্ষতি নেই। এ সবই শ্রীঠাকুরেরই কৃপা। মনে দুঃখ হয়েছিল যে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান, কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তাই কুম্ভে যেতে পারলাম না। সেইজন্য শ্রীঠাকুরই কৃপা করে এইভাবে কুম্ভে যোগ দেবার ব্যবস্থা করে দিলেন।" কনডাকটারকে বললাম, "এলাহাবাদে ক্যানসেল করব। তারপর আর রিজার্ভেশনের দরকার নেই।" এলাহাবাদে ডাক্তার গোবর্ধন ঘোষ শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের পরম ভক্ত। বিরাট বড়লোক। তাঁর বাড়ীতে উঠে তাঁকে বললাম—"ডাঃ ঘোষ, কুম্ভে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসিনি। কিন্তু তিরাত্র কুম্ভে বাস করতে চাই। একটা ছেঁড়া খোঁড়া কম্বল দিন, দামী জিনিষ দেবেন না, কাকে দিয়ে দেব, কে নিয়ে নেবে ঠিক নেই। সুতরাং কোন রকম একটা পেলেই হল। আর আপনার গাড়ী করে মা আনন্দময়ীর আখড়ায় পৌঁছে দিন। এই অনুরোধ।" ডাঃ ঘোষ তো একটু হেসে একটা দামী কম্বল দিয়ে গাড়ী করে মা আনন্দময়ীর তাঁবুতে পৌঁছে দিলেন। মাকে প্রণাম করে মণিমামার তাঁবুতে গিয়ে দেখি মাটির উপর খড় বিছিয়ে তার উপর বাঘছাল পেতে মণিমামা ধ্যান করছেন। কাছে গিয়ে কানে কানে বললাম "মণিমামা,—যা ইচ্ছা করলে মাঝে মাঝে ক্লেকলিভ্ দিয়ে দেন। সেই ক্লেকলিতে কুম্ভে চলে এসেছি।" মণিমামা খুব খুশী হয়ে বললেন, "বেশ করেছিস্ খোস, ধ্যান জপ ভালো করে কর।" ক্লেকলিভ্টা কি তা যাঁরা জানেন না তাঁদের জন্য জানাই করাসীদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে মেলামেশার প্রায় বিশেষ কোন বিধিনিষেধ মানা হয় না। এখন কেউ হয়ত একটা দিন সিনেমাতে কোন বন্ধু বা বান্ধবীকে নিয়ে কাটাতে চায়, অথচ অফিসে তো আর সে কথা ঘোষণা করে ছুটি চাওয়া যায় না। সেজন্য কারণ না দেখিয়ে যে ছুটি পাওয়া যায় তাকে বলা হয় ক্লেকলিভ্।

এই প্রসঙ্গে কুম্ভের কথা একটু বলা দরকার। যাঁরা কখনও কুম্ভে যান নি তাঁদের অন্ততঃ একবার কুম্ভে যাওয়া দরকার। ভারতের আসল শক্তি যে কোথায় তা এখানে এসে প্রত্যক্ষ অনুভব করা যায়। লক্ষ লক্ষ সাধু সন্তের আগমনে, তাঁদের বেদধ্বনি, রামায়ণ, ভাগবত পাঠে, প্রবচনে, ভজন সঙ্গীতে সারা মেলার আকাশ বাতাস যেন ধর্মীয় আধ্যাত্মিক উচ্চ ভাবধারায় একেবারে ভাগবত শক্তিতে ভরপুর। যে যাবে তাকেই স্পর্শ করবে। অভিভূত করবে। তাছাড়া কত রকমের সাধু যে আছেন, কত বিভিন্ন সম্প্রদায়, কত হাজার হাজার সাধু যাদের

আছেন, তাঁরাও মৌন মিছিল করে স্নানে চলেছেন, সমস্ত ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তি যেন সেই মেলায় মূর্তরূপ পরিগ্রহ করে বিরাজমান। কত নিম্ন মহাপুরুষ যে ছদ্মবেশে সেই মেলায় আসেন তার সীমা সংখ্যা নেই। অনেকে সেইজন্য লক্ষ সাধুর পদরজপূত স্নানে যাবার সেই পথের পবিত্র ধুলো সংগ্রহ করে রাখেন। বড় বড় মণ্ডলেশ্বর সাধু, শঙ্করাচার্যেরা, নাগাসন্ন্যাসীরা রামায়েৎ সাধুরা, বৈষ্ণবেরা সকলে উপস্থিত। কেউ হাতিতে চড়ে আসছেন, কেউ সোনার চতুর্দোলে—ঐশ্বর্যে মণ্ডিত অথচ পাঁকাল মাছের মত। দেখলেই বোঝা যায় ঐ ঐশ্বর্য একটা খোলসের মত। যে কোন মুহূর্তে ছেড়ে ফেলতে পারেন। সম্পূর্ণ আসক্তিহীন ভোগ—সে একটা দেখবার মত দৃশ্য, মন প্রাণ দিয়ে অনুভব করার মত ঘটনা।

এখন প্রয়াগ হচ্ছে দানের তীর্থভূমি। হরিশ্চন্দ্র এখানে সর্বস্ব দান করেছিলেন বিশ্বামিত্রকে। রঘু এখানে দান করেছেন। সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনও এখানেই সর্বস্ব বিলিয়ে ভগিনী রাজশ্রীর হাত থেকে চীবর খণ্ড নিয়ে রাজবেশটিও দান করে প্রাসাদে ফিরে আসতেন। তাই সেখানে সেই দানের যাতায়রূপ সকলকে অতিভূত করে। সঙ্গমে স্নান করার পর মনে হল কেউ যদি এখন এসে বলে, "নচিকেতা, তুমি যদি তোমার প্রাণটা দাও, তবে আমার এই উপকারটা হয়।" তাহলে সানন্দে প্রাণটাও দিয়ে দিতে পারি। এমনি হয়েছিল তখন সেই দিনের প্রভাব। ডাঃ ঘোষের কম্বল একজন চাওয়ায় তাকে সেই কম্বলটা দান করলাম।

স্নান সেরে মার কাছে যেয়ে দেখি মা তাঁর ভক্তদের নিয়ে সংসঙ্গে বসেছেন। একটা দিব্য আনন্দের স্রোত বয়ে চলেছে। সকলে সেই স্রোতে অবগাহন করে পবিত্র হচ্ছেন, আনন্দিত হচ্ছেন। মনে ইচ্ছা হল ঐ দিব্যানন্দের স্রোতে নিজেও অবগাহন করি। ওদের সঙ্গে যোগ দি। তখন হঠাৎ দেখলাম—একেবারে এই চর্ম চক্ষুতেই দেখলাম মা ভক্তদের লয়ে বসে আছেন, সৎসঙ্গ হচ্ছে। তাঁরা আনন্দ পাচ্ছেন আর একদিকে নিজে বসে আছি। আমাদের মাঝখানে পিতলের একটি তারের জাল। একেবারে বুঝিয়ে দিল তখন আলাদা, তোমার ঘর আলাদা। ওঁরা ও ঘরে আনন্দ পাবেন—তুমি তোমার ঘরে আনন্দ পাবে। এই দর্শনের পর হ'তে মা'র প্রতি যে আকর্ষণ, তা আর বোধ করতাম না। তারপরও বহুবার মাতৃ সন্দর্শন হয়েছে। হয়ত অন্য কাউকে দেখাবার জন্য নিয়ে গেছি, মা কত আদর যত্ন করেছেন কিন্তু সেই বিহ্বল ভাব আর ফিরে না।

সর্বশেষ মা'কে দেখেছি গত বছর পূজার পর যখন ঝাঁসী থেকে কাশী যাচ্ছি। ট্রেনে একটি ফরাসী মেয়ের সঙ্গে আলাপ হলো, নাম তার জোয়াকি। ভালো ইংরাজী বলতে পারে না, ফলে ভালো করে লোকের কথা বুঝতেও পারছে না, নিজেকে প্রকাশও করতে পারছে না। কথায় কথায় জানলাম সে মাত্র কয়েকদিনের জন্য ভারতে এসেছে আনন্দময়ী মা'কে দেখবার জন্য। কাশী যেয়ে মার খোঁজ করে মা কোথায় আছেন জেনে সেখানে যাবে, দর্শন করে ফ্রান্স ফিরে যাবে।

বললাম, "বেশ, চল কাশীতে, মার আশ্রম কোথায় আছে জানি। তোমাকে নিয়ে যাব এবং খোঁজ নিয়ে জানাব মা কোথায় আছেন।" কাশী যেয়ে শুনলাম মা-র আশ্রমে যেয়ে দেখি মা সেখানে রয়েছেন, একটু বাদেই দর্শন দেবেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর মা চেয়ারে করে এলেন, অসুস্থ। তবু দিব্য শ্রীমণ্ডিতা তনু। আমরা প্রণাম করলাম। জোয়াকি দূরে দাঁড়িয়ে থাকল, হাত জোড় করে। কাছে যেয়ে প্রণাম করল না। বললাম, "যাও প্রণাম করে এসো।" তার জবাবে সে যা বললো তার অর্থ এই যে তার নিজেকে মার কাছে অত্যন্ত অশুচি বলে মনে হচ্ছে। সেই অশুচি দেহ মন নিয়ে মা'র পরম সাত্ত্বিক-ভাবের কাছে যেয়ে সেই সাত্ত্বিক-ভাবের পীড়া উৎপাদন করতে তার মন রাজী হচ্ছে না। দুদিন দর্শনের পর তৃতীয় দিন যেয়ে শুনি মা হরিদ্বার কনখলে তাঁর আশ্রমে চলে গেছেন। শরীরকে রাখার জন্য মা কোথাও বেশীদিন থাকতে

পারতেন না। মা আসেন খবর চাউর হবার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ জনতা মাতৃ সন্দর্শনে আসতো। ফলে মাকে প্রায়ই অজ্ঞাতবাসে থাকতে হত। দুই একদিন এক জায়গায় থেকেই অন্যত্র চলে যেতে হতো। সারা ভারতবর্ষের প্রত্যেক বড় বড় সহরে মা-র আশ্রম বিদ্যমান। ঐ রকম একটি বড় আশ্রম গড়তে একজন সাধুর একটা জীবন কেটে যায়। সেক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত ঐ রকম বড় বড় আশ্রম নিত্য যেখানে নানা দেবদেবীর পূজা অর্চনার ব্যবস্থা করা সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদের জন্য থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা—এ যে কত বড় শক্তির পরিচয়, তা যাঁরা ঐ সব আশ্রমে যান নি তাঁরা অনুভব করতে পারবেন না। সাধুদের মধ্যে যাঁরা যে কোন মুহূর্তে দশ হাজার লোককে খাওয়াতে পারেন তাঁদের বলা হয় মণ্ডলেশ্বর। সেদিক থেকে মা আনন্দময়ীকে মহামণ্ডলেশ্বরী বললে অত্যুক্তি করা হবে না। দিল্লীতে একবার মা-র জন্মদিনে ভক্তদের দেওয়া হল একটি রুমালে বেঁধে একটি আপেল, এক টুকরা মিহরী, কিছু কাজু বাদাম। এ বাবদ সমাগত ভক্তদের দেবার জন্য আপেলই এসেছিল কয়েক ট্রাক ভর্তি।

মার কনখল আশ্রমে সন্ন্যাসিনী মায়েরা থাকেন, সব মুণ্ডিত মস্তক। বেদান্তবাদিনী। অপূর্ব পবিত্রতার সঞ্চার হয় সেই সন্ন্যাসিনী মায়েদের দেখলে।

একবার মণিমামা বরাহনগরে অসুস্থ। মা এসেছেন বালিগঞ্জ গার্ডেনস্-এ এক ধনী ভক্তের বাড়ীতে, সেখানে ভাগবত সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হবে। অর্থাৎ ৭ দিন সমগ্র ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হবে। ওখানে মায়ের খোঁজ করছি। দেখা হওয়া প্রায় অসম্ভব অথচ মণিমামার খবরটাও দিতে হবে। অবশেষে মা নামলেন; যেখানে ভাগবত পাঠ হবে, সেখানে বসলেন, সেক্রেটারী পরে আছি দেখে, মঞ্চের উপর নিজের আসনের কাছে বসতে বললেন। ভাগবতপাঠ সুরু হল। প্রায় তো ছুট্ কট্ করছে ন্যাশনাল লাইব্রেরী যেতে হবে। বেদের একটি মন্ত্রের ব্যাখ্যান নিয়ে সন্দেহ জেগেছে। সায়নাচার্য টীকা প্রভৃতি দেখে তার সমাধান করতে হবে. কোন রকমে একটু ফাঁক পেলেই মাকে প্রণাম করে বিদায় নেব। এই হল মনের ইচ্ছা—আর মণিমামার কথা তো আগেই মা আসার সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছি। মায়ের কাছে যে সর্বদা সমাদর পেতাম তার কারণ ছিল সম্ভবতঃ দুটি। একে তো মা সন্ন্যাসীদের বিশেষ আদর করতেন, তার উপর সস্ত্রীক ভাগ্নে, সুতরাং মার কাছে যখনই গেছি সর্বদাই বিশেষ সমাদর পেয়েছি। ভাগবতের একটি অধ্যায় পাঠ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মাকে প্রণাম করে বিদায় নেবার কথা বলতেই মা মিষ্টি করে যা বললেন তার মর্মার্থ, "পাঠ শেষ না হওয়া পর্যন্ত যেতে নেই।" এখন ভাবি কি অন্যায় আচরণই না করতে যাচ্ছিলাম। কৃপাময়ী মা কিভাবে সেই অন্যায় হতে বিরত করলেন। যেখানে ভাগবত পাঠ হয় সেখানে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়। পাঠ চলা কালে সেখান হতে চলে যাওয়া মানে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অভক্তি প্রদর্শন। তখন তা জানতাম না, পরে জেনেছি। শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের মত শ্রীশ্রীমাতা আনন্দময়ীও তো পার্থিব লেখাপড়ার ধার ধারেন নি। অথচ শাস্ত্রীয় কোন ব্যাপারে তাঁর জ্ঞানের কিছু মাত্র ন্যূনতা কখনও দেখিনি।

মায়ের আশ্রমে বর্ণাশ্রমকে বিশেষভাবে মর্যাদা দেওয়া হয়। বিদেশী মায়েই যখন যা ফ্লেচ্ছ। কত বিদেশী বিদেশিনী তাঁর কাছে আসতেন, কিন্তু তাঁদের পঙ্‌ক্তিতে বসতে দেওয়া হত না। ফ্রেড্ তখন সৈনিকবেশী, সন্ন্যাসী কালিকানন্দ—বৃন্দাবনে মাতৃসন্দর্শনে গেছি ফ্রেড্‌কে নিয়ে। তাঁকে আলাদা ভাবে উঠানে বসতে দেওয়া হল দেখে নিজেও তার পাশে তার সঙ্গে বসে প্রসাদ পেলাম। এ-বিষয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করা হলে মা যা বলতেন তার অর্থ হল এই যে, "আমি তো নিয়ম ভাঙতে আসিনি। বর্ণাশ্রমের নিয়ম প্রচলিত আছে। ব্রাহ্মণেরা অন্য জাতের সঙ্গে খাওয়া পছন্দ করেন না, তাই তাদের ভাব নষ্ট যাতে না হয় সেইজন্যই এই নিয়ম মেনে চলা।"

CALCUTTA

সীতারামদাস ওঙ্কারনাথজীর আশ্রমেও বর্ণাশ্রমকে বিশেষ মর্য্যাদা দেওয়া হয়। আমাদের ঠাকুরের আশ্রমে যে এটাকে আমল দেওয়া হত না তাতে আমরা খুশী। কারণ সভাই তো যাঁরা বিদেশ থেকে অত কষ্ট করে, নিজেদের সুখ সাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন দিয়ে ভারতের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ ভারতের কাছে আধ্যাত্মিক শক্তি ভিক্ষার জন্য এসেছেন, তাঁদের ছোঁয়া বা যখন তখন ঘুরে সরিয়ে রাখলে নিজেদেরই ছোট করা হয়। আমাদের আশ্রমে কত বিদেশী ভক্তদের নিয়ে গেছি। তাঁরা কখনও টের পান নি যে তাঁরা বিদেশী বলে তাঁদের দেশী ভক্তদের থেকে পৃথক করে রাখা হয়েছে।

এখানে একটা কথা মনিমামা তথা শম্ভুমহারাজ অর্থাৎ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সম্বন্ধে বলে রাখা দরকার। শান্তিনিকেতনে থাকার সময় এই মনিমামাই একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে বলেছিলেন, "নচি, এতবড় সাধু আর এখন বড় একটা নেই। তুই ওঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে নে"। মনিমামাও নিজেও শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে দীক্ষা নিয়ে, ঠাকুরের আশ্রম ছেড়ে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়ান। বড় বড় সংস্কৃতাচার্য্যদের এবং আরও অনেক নাম করা মণ্ডলেশ্বর সাধু মহাত্মাদের সঙ্গ করে শেষে মা-র আশ্রমে থাকেন। পরে আবার মাকেও ছেড়ে সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে দেহনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এ সম্বন্ধে মনিমামা নিজে এ দীন সেবকের কাছে যা বলেছেন, তার মর্ম্মার্থ এই যে "জমিদারের ছেলে ছিলাম, রসিদ দিয়ে প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করাই ছিল কাজ; সেই জমিদারী ছেড়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, ভাবমুখের গ্রাহক সংগ্রহ করে তাঁদের থেকে টাকা আদায় করে রসিদ দেবে। মনটা বিগড়ে গেল। যদি সেই টাকা আদায় করে রসিদই কাটতে হবে তবে জমিদারী ছাড়লাম কেন? তখনও বুঝিনি গুরুর প্রীতির জন্য তাঁর আদেশ পালনের জন্য যে কাজ করা তাই পূজা, তাই তপস্যা, আর নিজের বাসনা পূর্ত্তির জন্য যে কাজ সে কাজ আসক্তি আনে। সে কর্ম আমাদের বন্ধনের কারণ হয়। যাই হোক বরাহনগর ভাবমুখের টাকা আদায়ের ব্যাপার নিয়ে বরাহনগর আশ্রম ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে সব জায়গা ঘুরে দেখলাম, আমাদের ঠাকুরের মত আর একজন আছেন মা আনন্দময়ী। তাঁর মধ্যে মহা-শক্তির পূর্ণ বিকাশ। তবে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রচার নেই। আর মার প্রচার দশদিকব্যাপী. মার সঙ্গে চুক্তি হল মা সর্বদা তাঁর সান্নিধ্যে রাখবেন। শেষে দেখি মা চান, আমি তাঁর একটা আশ্রমের মোহান্ত হয়ে থাকি। এতো আমার মার জমিদারীতেই ছোট জমিদার হয়ে বসে থাকা। মোহান্ত হয়ে বসে আরামে খাওয়া দাওয়া করা যাবে। কিন্তু যে জন্য সংসার ত্যাগ সেই ঈশ্বরলাভের কি হবে? শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে থাকলে সেই তপস্যা হবে। তাই সব ঘাটের জল খাইয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার তাঁরই পায়ের তলায় নিয়ে এলেন। মা যখন শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখতে এলেন তখন শম্ভু মহারাজ কোথায় কার কাছে থাকবেন সেই কথা উঠল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর স্নেহ মাখা কণ্ঠে ডাক দিলেন 'শম্ভু' বলে। মাও তাকিয়ে আছেন শম্ভু মহারাজের দিকে। আদর ঝরে পড়ছে সে দৃষ্টি থেকে—শম্ভু মহারাজের দু'চোখ ছাপিয়ে নামছে জলের ধারা, মুখে কোন কথা নেই। অবশেষে মা বললেন, "ঠাকুর আপনার পায়ের ফুল আপনার পায়েই থাক।"

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা নাকি বলতেন—"আমি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একটি হাত।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সন্ন্যাসিসঙ্ঘপরম্পরা।

—:০:—

অনুরোধ

শ্রীঅবিভূষণ সরকার

অন্তর প্রহরী তুমি—জানি, তবু কেন অন্ধকারে ফেলে
মাঝে মাঝে হারিয়ে যাও অসহায় করে।
যখন শেষরাতের শিউলির মতো ঝরতে থাকো
টুপ্‌টাপ্‌—টুপ্‌টাপ্‌
তোমার বিরহে অন্তর কেঁদে ওঠে
অঝর ঝরে টুপ্‌-টুপ্‌
তখনো তো তুমি এসে হাজির হও না।
বলো—বলো—কেন?

তুমি আগে যেমন সজাগ ছিলে
তেমনি আবার হৃদয়ে এসে
আসন পাতো।
আমি নির্ভয়ে চলি আপন গন্তব্য পথে
—যেমন ঐ দীপ্ত সূর্য্য।
হৃদয় যখন হবে তারাক্রান্ত, তখন মশাল জ্বালিয়ে
আমাকে দিও সঠিক পথের নির্দেশ,
যেন আমি চলতে পারি আপন গন্তব্যে
উড়ন্ত বলাকার মতো নির্দেশিত স্থানে।
যেন ভুল না হয় আমার লক্ষ্য
তুমি সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখো।

তিনটি কবিতা

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

শেষ রক্ষা

আমরা আপার বরলিপি লিখি
ভাবনা তাহার আঙিনায়
কতটুকু থাকে কতটুকু যায়
সেই সুরে বাণী বন্দনায়।

আলো ও কালো

আলো আলো আলো।
হাজারো চোখে কালো
কাজল কালো রাতের কালো
মনের কালো রাতের কালো
'লোডশেডিংয়ে' বেজায় কালো।

ছুটি

ঘড়ি ঘরে ঘণ্টা বাজে
তড়িঘড়ি মনটা সাজে
পূজোর ছুটি পূজোর ছুটি
বিদেশ ভ্রমণ রেলের সময়
এই তো উটি, এই তো উটি।

অষ্টমীর ক্ষণ

স্বামী ভক্তেশ্বরানন্দ

হয়ে অষ্টাদ্ভুজধারী
ভয়াল রূপ ধরলে হরি
কোন্ রূপে থাক মা
আমায় তুমি বল না।
মহিষাসুর অত্যাচারী হলে।
তাই বুঝি তুমি এলে।

যেখানে ভগবান যারা
অপশক্তি হলে আপন হারা।
সে রূপের শক্তি মহান
মহিষাসুরের হয়লে যা প্রাণ।
বসি তোমার চরণতলে
করব মা জয় তবের বলে।

কলি দীর্ঘায়ু হোক, ভয় কি !

স্বামী বুধানন্দ

রাজা পরীক্ষিৎ একদিন রাজ্য পরিদর্শন করতে করতে দেখতে পেলেন ধর্ম এবং পৃথিবী কলির দ্বারা নিপীড়িত হচ্ছে। তিনি কলিকে বধ করতে উদ্যত হ'লেন। কলি সেই ধর্মত্রাণ রাজার পদপ্রান্তে নিপতিত হয়ে প্রাণভিক্ষা করলো এবং থাকার জন্য একটুখানি স্থানও চাইলো। রাজা তাকে দ্যূতক্রীড়া, মদ্যপান, পরস্ত্রী ও প্রাণীহিংসা এই স্থান চারটি দান করলেন। এই স্থান চতুষ্টয়—অনৃত, অহংকার, অশৌচ ও নিষ্ঠুরতা—এই চতুর্বিধ অধর্মের নিবাস ভূমি। কলি আরও কিছু স্থান চাইলে নৃপতি সুবর্ণকে তার বাসস্থান নির্দেশ করে দিলেন। এই সুবর্ণে—অনৃত, মদ, কাম, হিংসা ও কলহ—এই পাঁচটি অধর্ম একত্র বাস করে।

ভাগবতে বর্ণিত কলির এই প্রতিষ্ঠা আজ কত প্রকট। ভারতের ঋষিরা ছিলেন সত্যদ্রষ্টা, ত্রিকালদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞদ্রষ্টা। তাই তাঁদের বাণীও সত্যযুক্ত। কে না জানে আজ যারা অসৎভাবে চলছে, অবিশ্বাসের কাজ করছে, যারা দুর্নীতিপরায়ণ, পরস্ব অপহরণ করছে, যারা অকৃতজ্ঞ, উপকারের বদলে অপকার করছে এবং যারা সর্বতোভাবে ব্যভিচারে নিমগ্ন, তারাই কলি দেবতার কৃপায় ধন্য। তাদের বাড়বাড়ন্ত হচ্ছে, ঐশ্বর্য হচ্ছে, ক্ষমতা হচ্ছে। কারণ, ভাগবত বলছেন,—কলিদেব এদের মধ্যে সুরের মতই বিচরণ করে। অধার্মিক অবিবেকী মানুষের পক্ষে কলিযুগ সুবর্ণযুগ সন্দেহ নাই।

বিবেকবান ধর্মত্রাণ মানুষরা এই দেখে হায় হায় করছে। তারা তো দেখি প্রতিপদে এই ঘোর পাপের আকর কলিকে বিনষ্ট হবার অভিশাপ দেয়, তার মৃত্যু কামনা করে। অথচ মহাতেজস্বী সম্রাট পরীক্ষিৎ তো এক মুহূর্তেই কলিকে বধ করতে পারতেন। কিন্তু তা করলেন না। পরম বিবেকবান মহাধার্মিক এই রাজা কি তবে ঠিক কাজ করেন নি ? ভাববার কথা। আসলে পরীক্ষিৎ ছিলেন সত্যিকার একজন রসিক লোক অর্থাৎ লীলা-রসবেত্তা। ভাগবত বলছেন—"তিনি ছিলেন ভ্রমরের ন্যায় সারগ্রাহী, এই নিমিত্ত কলিকে সর্বতোভাবে বিনাশ করেন নাই। কলির বহু দোষ থাকিলেও একটি মহান্ গুণ এই যে, মনুষ্য সাধু সঙ্কল্প করিবামাত্র পুণ্য অর্জন করে, কিন্তু অসাধু সঙ্কল্প কার্যে পরিণত না করিলে পাপ ভাগী হয় না। তিনি আরও দেখিলেন যদিও কলি অসাধুবান অবিবেকী মনুষ্যগণের মধ্যে সুরের ন্যায় বিচরণ করিতেছে, তথাপি বীর ব্যক্তিগণের সমক্ষে সে ভীরুর ন্যায় পলায়ন করে। এই নিমিত্ত তিনি তাহাকে অকিঞ্চিৎকর দেখিয়া প্রাণসংহার করিলেন না।"[১]

ভাগবতের পরিপ্রেক্ষিতেই বলি—হে বিবেকীজন। হে বীর ধর্মত্রাণ। আপনারা একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, শান্ত চিত্তে, নিঃস্পৃহ মনে লীলা-রস-সাগরে ডুব দিন। কলির দৌরাত্ম্যে আপনাদের বিচলিত হবার কোনও হেতু নাই। এই কলিযুগ তো আপনাদের জন্য এক পরম সুযোগ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। কলির বিনাশ নয়, দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করুন। এ যুগে স্বয়ং শ্রীভগবান কৃপার পসরা নিয়ে বসে আছেন। অহেতুকী করুণার অফুরান প্লাবনে শুধু আপনাদের জীবনের তেলাটি ভাসিয়ে দিন। যাগ-যজ্ঞ ধ্যান-ধারণা কঠোর সাধনা কিছুই লাগবে না। শুধু একটু প্রার্থনা, একটু শরণাগতি। এই হ'লো তো কৃপার ধন নেমে এলো। অকিঞ্চিৎকর কলি তো শ্রীভগবানেরই অধীন। ত্রিভুবনেশ্বর তাঁর লীলাটি জমিয়ে রাখার জন্য এই অধীন রাজাকে সামান্য রাজত্ব আর সীমিত

১। ভাগবত ১ম স্কন্ধ ১৭, ১৮ পরিচ্ছেদ।

কিছু ক্ষমতা দিয়ে বসিয়ে রেখেছেন মাত্র। এ যুগকে শ্রীভগবান ভক্তদের জন্য করেছেন কৃপার যুগ, ক্ষমার যুগ। তাই তো বলেছেন—অসাধু সঙ্কল্প কার্যে পরিণত না করলে পাপ ভাগী হবে না, সাধু সঙ্কল্প মনে মনে করলেও পুণ্যার্জন হবে। আর বলেছেন, "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"—আমার ভক্তের বিনাশ নাই।

যুগটা এগিয়ে এসেছে। শ্রীভগবান পুনঃ পুনঃ অবতীর্ণ হয়েছেন ক্রমবিবর্তনে নিত্য নূতন রূপ ধরে। শ্রীচৈতন্যরূপে তিনি বিগলিত করুণার নামের গঙ্গা বইয়ে জীব উদ্ধার করলেন। আবার শ্রীরামকৃষ্ণরূপে গিরিশের বকলমা নিলেন, জীবের জন্য কল্পতরু হলেন। বললেন—যদি কিছুই না পারো, সকাল সন্ধ্যে নামও না করতে পারো, তবে বকলমা দাও, আমমোক্তারি দাও। এ যেন "আমার শরণাগত হও আমি তোমায় সকল পাপ হ'তে মুক্ত করবো—সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ / অহং ত্বাং সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।"—এরই পুনরুক্তি। মানুষের প্রতি করুণায় দ্রবীভূত হ'য়ে বললেন অনেক সহজ পথের কথা, অনেক আশ্বাসের কথা, ভরসার কথা। সেই কথামৃতের দু'একটি শুনলেই কলিযুগের ধর্মাশ্রয়ীগণ নিশ্চিন্ত আনন্দে পথ চলতে পারবেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন—"কলিতে অন্নগত প্রাণ। সব কর্ম বিধি অনুসারে করবার সময় নাই। ধনমূলে পাঁচন খেতে গেলে রুগীর এদিকে হ'য়ে যায়। তাই ভিতার মিক্সচার। নারদীয় ভক্তি, নামগুণ কীর্তন করা।" "জ্ঞানপথ বড় কঠিন পথ। এ পথ কলিযুগের পক্ষে নয়। তোমাদের ভক্তিপথ। ভক্তিপথ খুব সহজ আর ভালো। আন্তরিক ব্যাকুল হ'য়ে তাঁর নামগুণগান কর, প্রার্থনা কর, ভগবানকে লাভ করবে কোনও সন্দেহ নাই।" ..."ঈশ্বরকে প্রার্থনা করতে হয়- ঠাকুর কৃপা ক'রে জ্ঞানের আলো তোমার নিজের উপর একবার ধর আমি তোমায় দর্শন করি। তাঁর কৃপা না হলে দর্শন হয় না, কৃপা হলেই দর্শন হয়।'..."অহংকার ত্যাগ করে শরণাগত হও সব পাবে।"..."ঈশ্বরে মন রেখে সংসারে আছো তো! কেন সংসারে হবে না? অবশ্য হবে।"... "তাঁকে আমমোক্তারি দাও, তিনি যা করবার করুন। বড়লোককে ভার দিলে মন্দ করে না।" ..."কলিতে বলে, একদিন একরাত কাঁদলে ঈশ্বর দর্শন হয়।" "চাই ব্যাকুলতা।"

শুধু ঠিক করে নিতে হবে কিসের জন্য ব্যাকুলতা? ধনদৌলত ঐশ্বর্য দেহ-সুখ নাম-যশ? তবে যাও কলির দলে যোগ দাও। কলিদেবকে পূজা কর। কলির অনুশাসন মেনে চল। শ্রীভগবান তোমার জন্য সব ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন। আর যদি বল 'ঠাকুর তোমাকে চাই, ভগবদলাভই আমার জীবনের উদ্দেশ্য'—তাহলে শ্রীভগবানের শরণ নাও। এক পা এগিয়ে যাও তিনি সাত পা এগিয়ে এসে হাত ধরবেন। শুধু চাওয়াটা ঠিক করে ফেলো—পাবেই পাবে।

যুগ আরও এগিয়ে এসেছে। শ্রীভগবানকে আমরা পেয়েছি শ্রীসত্যানন্দ রূপে। কত করুণায় কত ক্ষমায় কত সহানুভূতিতে ভরা হৃদয় নিয়ে তিনি কলিযুগের ধর্মাশ্রয়ীদের পুনরায় আশ্বাস দিয়ে গেলেন ভরসা দিয়ে গেলেন এই সেদিন। বলেছেন—"তিনি তো জানেন, আমরা ঠিক পারি না—আমরা তাঁর অবুঝ ছেলে।"..."তাঁর কাছে ঠিক ঠিক চাইলে ঠিক ঠিক পাবে। ঠাকুরই এদিক ওদিক করে ঠিক ক'রে নেবেন।"..."এ যুগের ঠাকুর বড় বেশী কৃপাময়। একটু করলেই ঠাকুর কৃপা করবেন। এ যুগ কৃপার যুগ। কারণ এ যুগে বাইরের টান তিনিই বেশী করেছেন, তাই কৃপাও বেশী করতে হবে।" কত দরদী অন্তর নিয়ে অবতীর্ণ হ'লে জীবের জন্য এমন করে বলা যায়। শুধু আশ্বাস নয়, প্রার্থনার ভাষাটিও দিখিয়ে দিয়েছেন সহজ করে—"সকলেই এ প্রার্থনা করতে পারো—ঠাকুর। তুমি নিজের কৃপায় নিজেই এগিয়ে এসো। আরও মূর্ত হ'য়ে ওঠো।"..."তিনি কৃপা ক'রে জোর ক'রে নিয়ে চলুন তাঁর দিকে—এই প্রার্থনা। হে ঠাকুর! তুমি ভেটাও আসাও, সব জোগাড় করেও দাও, তোমার যত আছে সব কর—এই প্রার্থনা।"...

ভাগবতে যে কথা বলা হয়েছে, পল্লীগ্রামের নিরক্ষরা কুলবধূরূপে অবতীর্ণা জগজ্জননী শ্রীসারদা মা'র মুখেও সেই কথা নোতুন ক'রে শুনেছে এ যুগের মানুষ। "কলিতে মনের পাপ পাপ নয়।" তবুও পথে এগিয়ে যাওয়ার কত বড় ভরসা।

অবশ্য মনের পাপের মাফি নেই, ক্ষমা আছে, তার মানে এই নয় যে, দিনরাত মনের মধ্যে কুচিন্তার জাল বুননেও বৈকুণ্ঠ বাঁধা আছে। কারণ, মনের পাপের পুরস্কার ঘোষণা কেউই করেন নি। অতএব মনটাকে শুভ চিন্তায় ভরিয়ে রাখার চেষ্টাটুকুও রেখে যেতে হবে। চাওয়াটা যদি ঠিক ঠিক হয়, তিনি অপূর্ণতাগুলো এদিক ওদিক করে ঠিক ক'রে নেবেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাই এক পা এগোতে হবে, প্রার্থনা করতে হবে, সমর্পণ করতে হবে, অক্ষমতার জন্য বলতে হবে—'ঠাকুর পারছি না, তুমি দেখ, তুমি এসে হাত ধর।' যেমন পরীক্ষার খাতায় একটু কিছু লেখা থাকলে নম্বর দেবার scope বা অবকাশ থাকে, প্রয়োজন মত grace দেওয়া যায়। কিন্তু blank খাতা দিলে বা পরীক্ষায় না বসলে শিক্ষক নম্বর দেবেন কোথায়। তাই 'সাধু সঙ্গের' কথা, নাম-গুণগানের কথা, প্রার্থনার কথা, ঠিক ঠিক চাওয়ার কথা, শরণাগতির কথা, এসবও বলা হয়েছে।

মোট কথা—অধর্মের আকর এই কলির প্রভাব সব যুগেই রয়েছে। রাবণের রাজত্বে, দুর্যোধনের রাজত্বে শত শত অঘিবা ঘটনার ইতিহাসে কলির প্রভাব পরিস্ফুট। কিন্তু কলিযুগের এই অজস্র সুবিধা অন্য কোনও যুগে ভক্তরা এমন ক'রে পায় নি। কলিতে শ্রীঠাকুর যেন ধর্মের রাজ্যে ভরাবভার দেওয়াল ভেঙে দিয়েছেন। ধর্মপিপাসুর তৃষ্ণা নিবারণের জন্য খুলে দিয়েছেন করুণার জলসত্র। কলিযুগ কৃপার যুগ হ'য়ে মানুষের কাছে উপস্থিত হয়েছে। তাই বলি কলি দীর্ঘায়ু হোক্, ভয় কি।

"কলিঃ সাধুঃ কলিঃ সাধুরিত্যেবং শৃণ্বতাং বচঃ।" (বেদব্যাস—বিষ্ণুপুরাণম্‌.দ্বিতীয় অধ্যায় ষষ্ঠাংশ ৬)

—:০:—

ও চরণ আমি চুমি

অরুণশীল

তোমার ইচ্ছায় চলিতেছি আমি
আপন খেয়ালে নয়,
তুমিই নিয়তি বড় যে কঠিন
মনে জাগে তাই ভয়।
কখন কোন্ সে প্রলোভন জালে
ফেলে দিতে পার তুমি
কিংবা তোমার অহেতুক কৃপা
পেয়ে যেতে পারি আমি।
এ জীবন তাই ফেলে দিতে চাই
তোমার চরণ তলে
ঠিক করে তুমি গড়ে নাও প্রভু
আমি যে তোমারই ছেলে।
নিয়তির রূপে কোন্ সে আড়ালে
বসিয়া রহিয় তুমি
কৃপার পরশ পেয়ে আমি তাই'
ও চরণ যাব চুমি।

উমার শিবার্চনা

সুশীলকুমার লাহিড়ী

যেচ্ছাবিহারী দেবর্ষি হেরি একদা উমাকে পিতার কাছে
যোষণা করেন হরের ঘরণী হবার ভাগ্য ইহার আছে,
আপন প্রেমের প্রভাবে এ মেয়ে হবে শঙ্কর-অঙ্কভাগী,
অর্দ্ধাঙ্গিনী জানে শঙ্করও রবে জেনো এ'র চিরানুরাগী। ৩০
এই কারণেই কন্যার লাগি যোগ্য জামাতা সন্ধানে
বিরত থাকেন—বিবাহোচিত বয়স অতিক্রমের পানে
জেনে—কারণ পর্বতরাজ এই চিন্তায় পরিপ্লুত—
অদ্রিই শুধু প্রাপক তাঁহার মন্ত্রণারা যে হোবি পূত। ৩১
যেহেতু কন্যা প্রার্থনা নিজে করেনি কখনো মহেশ্বর
তাই তাঁর হাতে কখনো উমাকে যেন নি সে যেচে সমর্পণ,
প্রার্থনা যদি ব্যর্থতা লভে এই ভয়ে যত গুণী ও জ্ঞানী,
কাম্যবস্তু যাচ্ঞা না করে উদাসীন হয়ে থাকেন জানি। ৩২
পূর্বজন্মে সতীরূপ ধ'রে দক্ষরাজের কন্যা হয়ে
জন্ম নিয়েই এই পার্বতী পতিনিন্দার দারুণ ভয়ে,
দক্ষযজ্ঞে আপনারে বলি দিয়ে পার্বতী ত্যজিল দেহ,
সব আসক্তি বিমুক্ত ভোলা করেন নি দার পরিগ্রহ। ৩৩
সেই হ'তে শিব নির্জ্জন কোন গুহাতলে পাতি কৃত্তিবাস,
হিমালয় সানুদেশ-বিলগ্ন দেবদারু বনে করেন বাস,
অভিষেক বারি সিঞ্চিয়া চলে সেই তরুমূলে গঙ্গা ধীরে
সুরনাভি সৌগন্ধ মোদিত কিন্নরগীতি যাতিয়া ফিরে। ৩৪
শিলাজতু-ভাস্ত রঙে রঞ্জিত আর সুবাসিত শিলার পরে
প্রমথনাথের যত অনুচর আসি সেথা উপবেশন করে। ৩৫
কানেতে তাদের নমেরু ফলের কুণ্ডল শোভে অলঙ্কার,
গৈরিক গুঁড়া বিলিপ্ত দেহ—বসন ভূর্জ পত্র সার। ৩৬
বিশ্বনাথের বৃষ ধুরাগ্রে তুষার শিখরে আঘাত করে,
এ দৃশ্য দেখে তার পানে চেয়ে সবাহি পশুরা ভয়েই মরে ;
সিংহের ঘোর হুঙ্কার শুনি সে বৃষরাজের জাগায় ক্রোধ,
তাই সদর্পে গুরু গর্জ্জনে কাঁপিয়ে তোলে সে শৈলদেশ। ৩৭
সূর্য্য, চন্দ্র, যজমান আর ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্

মৃষ্টশিষ্ট-ধর এই শিব কোন কামনায় করেন হোম ?
সংগ্রহ করে যজ্ঞ সমিধ যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দান,
আপনারে পূজা আপনি করা এ—পুরাইতে কোন মনস্কাম ? ৫৮
এই গিরিরাজ হিমালয় যিনি সব দেবতার পূজ্য জানি,
কন্যারে ডাকি আদেশ করেন—পরমপূজ্য শিবেরে মানি,
সব সখীদল মিলিয়া শিবের পূজার্চনার হইতে রত,
অর্ঘ্য রচিয়া গ্রহণ করিতে বিশ্বনাথের পূজার ব্রত। ৫৮
নারীসঙ্গ যে যোগসাধনার সাধন লক্ষ্যে বিঘ্ন আনে,
তপো নিমগ্ন পরম যোগীও এ সত্যটুকু গভীরে জানে ;
তবু যোগীবর শৈলসুতার সেবা গ্রহণের অভিপ্রায়
প্রকাশ করিয়া জানালেন তাকে প্রসন্ন মনে নিষিধায়।
বিকারগ্রস্ত হওয়ার কারণ থাকা সত্ত্বেও বিকারহীন
যাঁরা ধীর তাঁরা এমনি থাকেন—অবিচলচিত্তে কাটান দিন। ৫৯
আসন বেদীটি অতি সযতনে সম্মার্জিয়া পূজায় লাগি,
প্রতিদিন ফুল চয়ন করিয়া আনে মহেশের সেবানুরাগী ;
পূজাভিষেকের ফুল আর ফুল সংগ্রহ করে সুকেশী মেয়ে,
ব্রত উপবাস পালন ক্লান্তি দূর করে হরমুখেতে চেয়ে ;
চন্দ্রচূড়ের ললাট চন্দ্র রিক্ত কিরণে সিনান করি
ব্রত হইল পার্বতী তাঁর প্রেমে ও পূজায় হৃদয় ভরি। ৬০

["কুমারসম্ভব" কাব্যের প্রথম সর্গের অন্তর্গত ৫০ সংখ্যক শ্লোক থেকে ৬০ সংখ্যক শ্লোক অবধি অনূদিত কাব্যরূপ।]

"সত্যিকার যাঁরা সাধু তাঁদের সমস্ত কার্য্যের মধ্যেই অপরের মঙ্গল নিহিত থাকে। বাহ্যতঃ যেগুলি সামাজিক ভাবে অন্যায় বলে ধরা হয়, সে রকম কোনও কাজ ক'রেও তাঁর দ্বারা অপরের মঙ্গল করেন।"

—শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দ [স্মৃতির তীর্থে চতুর্থ খণ্ড হইতে]

দীনের দরদী

স্বামী অরূপানন্দ

কেন গেলে তুমি যে দয়াল মোর
ছেড়ে এ ধূলার মায়া।
এসেছিলে জানি ভালবাসা দিয়ে
ভরাতে সবার হিয়া।
ভালবাসা সবা পাওনাই বুঝি
অভিমানে গেলে লুকায়ে,
জীব কি গো পারে ভালবাসা দিতে
যদি নাহি লও বুকে জড়ায়ে।
করুণা তোমার অফুরাণ প্রভু
দিওনা গো দূরে সরায়ে।
ঐ চরণের ধূলা মাখি সারা গায়
রহিব অজ বিহায়ে।
আমি হে দেবতা পেয়েছ তুমি যে
অনেক কাঁটার জ্বালা,
পেয়েছ যতই আঘাত বেদনা
করিয়া দিয়াছ আলা।
তুমি যে গো নাথ এসেছিলে নামি
দুঃখীজনে কাছে টানিতে
পতিত পাবন নারায়ণ রূপে
এলে পুন এই মাটিতে।
দিব্য মধুর রূপের আলোয়
কত মহাজন এল ছুটে,
অতি সাধারণে স্থান দিলে তুমি
মোহ গেল তার টুটে।
প্রেম মূরতি প্রেম অবতার
রচিলে সুরের মায়া
সে সুর আবেশে বিশ্বভুবন
ধরেছে নূতন কায়া।
এ রূপ প্রকাশ হয় নাই কভু
হয় নি তো হেন লীলা।
প্রেম সিঞ্চিত সন্ন্যাস ব্রত
হল যে প্রাণের মেলা।
ত্যাগ বহ্নিতে আহুতি দেওয়ালে
বাসনার যত গ্লানি
ঘুচে দিলে যত হীন আবরণ
স্নেহের পরশ খানি।
কত অসহায় লভিল যে প্রাণ
কত বঞ্চিত পেল আশা
কত ম্লান মুখ আলোকিত হল
কত মূক পেল ভাষা।
তুমি যে দীনের দরদী ঠাকুর
এলে গো অজ মোহায়ে।
যতই লুকাও নিয়েছ যে তার
হবেই তোমারে আদিতে।
বরষের পর বরষ বাদিয়া
কত যে সঙ্গ লভেছি
মনে পড়ে যায় সোনাময় দিন
মধুর স্মৃতিতে ভরেছি
তবুও তো জান এ বহন জ্বালা
বেদনায় পারাবার
সহিতে পারি না ওগো সুন্দর
এ বিরহের দুখ ভার।
বিরহের মাঝে মিলন মধুর
সে বিরহ কতদিন
আর তো সহে না দুরন্তা প্রভু
দাও গো চরণ চিন্।
মরণ তো হয় মহাবিস্মৃতি
সব জীবন তোরণ যার
নিয়ে চল মোরে—হাতে ধরে ধরে
করগো আমারে পার।

লীলার মাধুরী রচিলে কত যে
মায়ের চরণ ঘিরে
বুকে ক'রে মা ভবতারিণীরে
এলে বিশ্বভুবন ঘুরে।
মহাশক্তি মহাকালী মাগো
মহাকাল গলে দোলে
এ অপরূপ লীলার প্রকাশ
হয়নি তো কোনও কালে।
গিরিধারীলাল শ্রীরাধারাণী
কিশোর গোপাল হরি
শিব ও শক্তি সকলেই আসে
তোমার লীলার স্মরি।
ভব—জীবন ছন্দে হসিত হল
ছন্দ ভুবনা যত
রূপ সৃষ্টির অনুপম ছবি—
গোপনে এঁকেছ কত
নব নব রূপে নব নব ভাবে
রচি নিজের দেবালয়
পেতেছ আসন শিব সুন্দর
নাহি যার কোনও ক্ষয়।
কত মধুকথা শুনায়েছ সবে
কত গান কত সুরে
হৃদয়ের ব্যথা কাড়িয়া নিয়েছ
বুকে টেনে স্নেহ ভোরে।

ভিজে ভিজে তুমি বিলায়ে দিয়েছ
নিজের জীবনখানি
সন্তান প্রাণ ভালবাসা দিয়ে
ভরিয়া দিয়েছ আনি।
আজও হেরি ভাই প্রতি পরমাণু
প্রতি লতাপাতা রেখা
নীরবে নিভৃতে করে যায় শুধু
তোমার বিরহ গাথা।
রামকৃষ্ণ সারদা মাথা শুভমনে
কেবা এসেছিলে তুমি
শ্রীরাধা গোপাল একসাথে হেরি
ধন্য ধরণীভূমি।
ভুল ক'রে যদি ভুল বুঝি নাথ
দিও মোর ভুল বুঝায়ে
দূরে যদি কভু চলে যাই আমি
দিও না গো দূরে সরায়ে।
বন্ধন হতে টানিয়া এনেছ
তোমার চরণে যবে
জানি আমি সখা বাহুটী বাড়ায়ে—
লইবে আমারে বুকে।
নেমে এস প্রভু শিব সুন্দর
থেকো নাগো আর লুকায়ে
প্রকাশিত হও নয়ন মোহন
রহগো হৃদয়ে হৃদয়ে।

কীর্ত্তনান্তে ঠাকুর বলিতেছেন,—"এই কাজ হলো, আর সব মিথ্যা। প্রেম ভক্তি—বস্তু, আর সব অবস্তু।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত [২য় ভাগ]

The Legend of Ramanujacharya

P. S. Rao

"In Kaliyuga the life of man is centred on food. He cannot get rid of the feeling that he is the body and the ego. Therefore, the path of devotion is prescribed for this cycle. This is an easy path. You will attain God if you sing His name and glories and pray to Him with a longing heart."

—*Sree Ramkrishna*

"The whole thing is to love God and taste His sweetness. He is sweetness and the devotee is the enjoyer. The devotee drinks the sweet Bliss of God. Further, God is the lotus and the devotee is the bee. The devotee sips the honey of the lotus."

— *Sree Ramkrishna*

From time immemorial in the South in Tamil region the devotion of Alwars was renowned. Prominent among them was Nammalwar who composed several devotional songs. The innumerable devotion packed songs of Alwars came to be collectively known as the fifth Veda. The Alwars were great devotees and were twelve in number. Some of them were not Brahmins. In fact, one among them was a Harijan while one was a lady. By their representative character they demonstrated that caste was no barrier for receiving divine grace.

Ramanuja followed the pattern set by the Alwars. Besides, in a way he could also be said to be a revolutionary in his outlook in the sense that he threw open the Hindu temples to Harijans. His preachings were meant to attract everyone without distinction of caste or one's station in life. In spite of his erudition and immense hold on people he remained humble. Like Radha who was prepared to go to the darkest hell for serving her *Charanamrit* to Sree Krishna only to relieve the Lord of his pretended headache, at the cost of incurring his *guru's* wrath for breaking the vow of secrecy of the holy *mantra* imparted to him, Ramanuja gave Tiru Mantra to a huge congregation of ordinary people to help as many of them as possible to salvation. He was instrumental in spreading the Vaishnava faith all over the country. In fact, his gospels were a source of inspiration to others to spread Vaishnavism later in other parts of the country. Notable among them were Madhwa in Mysore, Ramananda in the north, Sreekrishna Chaitanya in Bengal, Namdev, Eknath and Tukaram in Maharastra.

In the small town of Sree Perumbuttur thirty miles from Madras, there once lived a pious Brahmin, Kesavachari and his worthy wife Kantimati. Kesavachari was an adept in the performance of *yegnas*. For a long time the devout couple remained childless. They went to Triplicane in Madras and did an *yegna*. Parthasarathi (Vishnu) of the temple in Triplicane appeared to Kesavachari in a dream and conveyed to him that

he would be taking birth as his son. Thus in the year 1017 A.D. the couple was blessed with a son whose name was to be associated with the famous Vaishnava cult, the most appealing ingredient of which is *bhakti*.

At the age of sixteen Ramanuja was married. Unfortunately his wife was egoistic and did not prove herself to be a worthy consort of a great saint. Sometime later Ramanuja's father died. Thereafter the family shifted to Kanchi and settled down there. In Kanchi Ramanuja took initiation from one Yadavprakash. Yadavprakash was a staunch *Advaitist* while Ramanuja was temperamentally a believer in the reality of the world and in worship of God with form. Soon on the interpretation of certain religious texts differences arose between the *guru* and the disciple resulting in the *guru* asking the disciple to leave him.

Alavandar, the famous head of the *mutt* in Srirangam, was impressed by Ramanuja's learning and thought of installing him in the apostolic seat of Srirangam. But this could not materialise during Alavandar's lifetime. When he drew near his end, his disciples sent one Perianambi, also known as Mahapurnulu, to bring Ramanuja. By the time he arrived the master was no more When Ramanuja approached the body he saw three out of the five fingers of the right hand of the master s body folded. The disciples explained this to mean that the master had three unfulfilled desires, the chief of which was an easy commentary on the Brahma Sutras.

Ramanuja returned to Kanchi. In Kanchi at that time there lived a great devotee, Kanchipurnulu, who could hold communion with Lord Varadaraja Swami of the temple. Through him Ramanuja came to know that his real *guru* was one Mahapurnulu (Perianambi Enquiries revealed that the great *guru* lived at Srirangam. Driven by restlessness to get initiation soon, Ramanuja started for Srirangam while unknowingly the *guru* simultaneously started for Kanchi for Ramanuja. The two met half way where after due religious rites Ramanuja was given initiation of Dwaya Mantra. Ramanuja found that his wife was an impediment to his progress towards God realization. He was, therefore, compelled to resort to a stratagem and separate himself from her and take *sanyas*.

Ramanuja vigorously took to his worship, studies and preaching. His erudition, his humility, the burning desire in him to help people to attain God spread his fame far and wide. When Ramanuja was preaching before an assembly in a *mutt* in Kanchi, his former *guru* Yadavprakash, stepped into the *mutt* only to be captivated by the blissful appearance of Ramanuja and the divine aura surrounding him. He put Ramanuja certain intricate questions to test the depth of his knowledge. Ramanuja could easily get them answered through one of his disciples to the overwhelming satisfaction of the querist, Yadavprakash felt himself impelled by divine force to fall at the feet of Ramanuja and become his disciple. He was initiated to *sanyas* by Ramanuja and was given the name of Govindji. In pursuance to the command of his *guru*, Govindji wrote a treatise entitled "Yetidharma Samuchayam" and dedicated it to his *guru*. Govindji lived till well past eighty and then ended his sojourn in the world.

Ramanuja learnt a great deal at the feet of his *guru*, Mahapurnulu. Impressed and immensely pleased with Ramanuja, the *guru* directed his son, Pundarika, to become a disciple of Ramanuja. In a place called Tirukotiyur near Srirangam there lived a renowned scholar saint, Goshtipurnulu. Mahapurnulu advised Ramanuja to approach Goshtipurnulu and receive from him Tiru Mantra *Upadesa*. After initial reluctance Goshtipurnulu initiated Ramanuja into Tiru Mantra, adding that those who hear that *mantra* even once were certain to attain salvation. Ramanuja felt extremely elated at receiving a *mantra* of such potency. Actuated by a desire to help people, Ramanuja repaired to the nearby temple and, climbing up its tower, loudly called upon the people to come near him to receive something invaluable. There was soon a huge expectant crowd. He addressed the gathering as sisters and brothers and by repeating three times loudly the *mantra* that he recited, he invited them to prepare the way for their redemption. In no time the entire crowd was converted into an assembly of ardent devotees of God and began to chant the *mantra* with deep fervour. The episode reached the ears of Goshtipurnulu who flew into a great rage when he saw Ramanuja who went to salute him after the drama that was enacted near the temple. The *guru* told him that a special hell had to be created to consign him to it for the crime he had committed in initiating a whole crowd with Tiru Mantra. Ramanuja replied with utmost composure that by his communicating the holy *mantra* to the crowd if so many people could attain salvation, he would not mind himself being condemned to the darkest hell. The *guru's* anger melted away at the solicitude Ramanuja showed for the welfare of the people even at the risk of his going down to the deepest fathoms. In expiation of his anger, the *guru* entrusted his son, Sowmyanarayana, to the care of Ramanuja as the latter's disciple.

Ramanuja had no reputation of having done any serious penance. In fact, it was for this reason that Goshtipurnulu was in the beginning unwilling to initiate him into Tiru Mantra. But by virtue of sheer *bhakti* he reached far greater heights than one practising austere penance. He acquired immense spiritual powers which he utilised for the benefit of mankind. He was instrumental in leading many people to salvation. On the mundane plane he rid several people of their ailments. He restored eye sight to one of his disciples who became totally blind. His mere look would free one from suffering and would give him at once peace and spiritual solace. Like Sree Ramakrishna who could talk face to face with Mother Kali, Ramanuja had the reputation of talking directly to the divine. In short, if Sankara was an incarnation of Shiva, Ramanuja was of Vishnu.

In their craving for making money, the priests of Ramanuja's time were perhaps not much different from the priests of today. On account of the presence of the saint in Srirangam the priests of Ranganath temple in Srirangam could not make as much money as they were making before his advent in Srirangam. This enraged the priests. Having planned to get rid of Ramanuja once for all, the chief priest of the temple invited Ramanuja to his house for meals after having ensured that his willing wife

mixed poison in the preperations to be served to him. Ramanuja sat before the meal but in his bright and tranquil face the housewife could clearly see the reflection of her guilty conscience. Overcome by grief the lady told Ramanuja the truth and sent him away. Ramanuja, however, mentioned this to no one. Instead, as usual that evening he went to the temple for the *darshan* of Ranganath. Not to be defeated the chief priest mixed poison in the *charanamrit* that he served to the saint Ramanuja knew that the holy water contained a poison powerfull enough to despatch at a stretch ten people on the spot. But with the name of the Lord on his lips he took the poison and yet nothing untoward happened. Seeing that Ramanuja was no ordinary saint the priest fell at his feet and was readily forgiven.

One Yegnamurty, a scholar and a staunch supporter of *advaita* philosophy challenged Ramanuja to a debate on the relative merits of *advaita* philosophy and *visishtadwaita* philosophy preached by Ramanuja. The debate lasted for seventeen days. Seeing no end to the debate, Ramanuja prayed to the Lord for help which was duly promised. Next day when Ramanuja appeared as usual for debate, Yegnamurty had a shock of his life to see a dazzling divine aura around the saint. He felt the futility of further debate and fell prostrate before Ramanuja beseeching him for taking him as his disciple which was accepted. Ramanuja gave him the monastic name of Devarajmuni. At his *guru's* bidding, Devarajmuni wrote "Jnana Saram" and "Prameya Saram."

In the *mutt* in Srirangam of which Ramanuja was the head, there were seventy four disciples. All those disciples were eminent scholars, the prominent among them being Dasarathi, Kuresulu Sundara Babu, Chinna Nambi, Soumya Narayana, Yegnamurty, Govinda Bhattar etc. The disciples shone like so many stars with Ramanuja as their moon in the centre, all of them shedding their light of learning. For the purpose of composing his classic of Sree Bhashyam", Ramanuja felt the need for a perusal of a treatise called "Bhodhayana Vrutti" which could be had only in the Sarada Mutt in Kashmir. Along with a disciple Kurtalwar, Ramanuja reached Kashmir but the *pandits* in the *mutt* were not willing to give the book to Ramanuja. The saint's prayers to Goddess Sarada were answered by the presentation of the book by the Mother to the saint. Ramanuja and his disciple took leave of the *pandits* and started on their return journey with the book in their custody. Meanwhile the *pandits* discovered that "Bhodhayana Vrutti" was missing. So some of them went in pursuit of the saint and recovered the book. But nothing was lost as in the meantime the disciple, Kuratalwar, by one reading of the book while it was in their possession reproduced *verbatim* in the matter of a couple of months what all the book contained. Thereafter Ramanuja composed his famous treatise, "Sree Bhashyam" in addition to several other books like "Vedantadeepam, Vedanta Saram, Vedanta Sangraham and Geeta Bhashyam".

Ramanuja travelled far and wide holding discourses, discussions and debates, defeating *advaitists* and spreading vaishnavism With his seventy four disciples he went to Kanchi and had *darshan* of Varadaraja Swamy. From there he went to Kumbakonam and converted several *pandits* to his point of view. He visited Madurai, Trivandrum and

from there went to north visiting Dwaraka, Mathura, Brindaban, Solagram, Saketa Badri, Naimisam, Pushkar etc. He again visited Sarada *Mutt* in Kashmir. From Kashmir he reached Puri and then Srikurmam. At Srikurmam the deity was being worshipped as Shiva. By the exercise of his spiritual powers he proved that the deity represented Vishnu in the form of Kurma Avatar. From there he visited Simhachalam and next Ahobilam where he established a *mutt*. But after his arrival at the famous temple of Venkateswara at Tirupati a remarkable event happened. Before Ramanuja's visit the deity at Tirupati had no emblem of either Shiva or Vishnu. So a fierce controversy was raging between the followers of Shiva and Vishnu, each claiming that the image represented their favourite deity. Ramanuja offered meditation. He collected the emblems of both Shiva and Vishnu and locked them up in a room. The next day the decision about the deity being Shiva or Vishnu would be automatically known depending upon the particular emblems from the locked room the deity would take and adorn itself with. As next morning the deity was found with the conch and discus it was declared that the deity at Tirupati on the seven hills represented Venkateswara (Vishnu). However, some of those who do not subscribe to vaishnava faith say that the image at Tirupati was not originally of Venkateswara but was converted into such a one by Ramanuja by the exercise of his supernatural powers. From Tirupati after visiting Kanchi, Madhurantakam etc. Ramanuja finally returned to Srirangam.

Ramanuja could easily spot out potential devotees even among those deeply wedded to worldly life. In Srirangama festival of Ranganath was being watched by several people, including the saint and his disciples. While so watching the saint's look fell on one, Dhanurdas, the chief bodyguard of the local king, who, while fanning his fiancee with one hand and holding an umbrella over her head with the other, became unashamedly unmindful of his surrounding and went on gazing into her eyes all the time. It was as though with his fiancee by his side time stood still for him. Ramanuja was impressed by the man's single minded adoration and devotion, though towards a worldly object. The saint called him and the explanation offered was that he found his fiancee's eyes most bewitching in the world. would he like to see eyes manifold times more bewitching than those then engaging his attention ? The answer was in the affirmative. Ramanuja thereupon took Dhanurdas inside Ranganath temple, applied *tulsi* water to his eyes and asked him to look at the eyes of the Lord. Dhanurdas was swept off his feet for he saw something which in a way was equivalent to the difference between a pair of mere glass beads and the rarest diamonds. He fell at the feet of Ranganath and Ramanuja and became one of the most devoted disciples of the latter.

In a dream Lord Vishnu conveyed to Ramanuja that his idol could be found at a certain place in Melcote. The saint searched for the idol and found it to be in a perfect condition. He installed the idol and got a temple constructed For securing 'Ustav Vigraham' (Idol representing the installed deity for being taken in processions), however, there was considerable difficulty for which the saint unhesitatingly took the help of some Harijans. For this reason Ramanuja declared that for three days in a year Harijans could enter the temple at Melcote.

In his *mutt* at Srirangam there was no distinction between big and small. The *mutt* had also its share of sanyasin mothers some of whom were highly learned. In the *mutt* a perfect sense of dignity of labour prevailed, and all the work was considered equal.

The gist of Ramanuja's philosophy which is known as *Visistadwaita* is as below :

(1 He vehemently opposed the *mayc* theory of Sankara. According to him the material world is real.

(2) The individual soul and the material things come from the body of God. God is no doubt real but the individual soul and the material things are also real. Though the world of matter and the individual souls have a real existence of their own, still neither of them is essentially the same as God. For, while God is eternally free from all imperfection, matter is unconscious and the individual souls are subject to ignorance and suffering.

(3) God is a personal being and Vishnu is supreme. The view of personal God is in direct opposition to the theory of *nirguna* Brahman propounded by Sankara. The sense of personal communion with God involves a real fellowship with an "Other" divine personality. "The *nirguna* Brahman, which stares at us with frozen eyes regardless of our selfless devotion and silent suffering, is not the God of religious insight. Sankara's method, according to Ramanuja, leads him to a void, which he tries to conceal by a futile play of concepts. His *nirguna* Brahman is a blank suggesting to us the famous mare of Orlando, which had every perfection except the one small defect of being dead. Such a Brahman cannot be known by any means, perception, inference or scriptures."

(4) In essence Ramanuja held that the mechanical repetition of the formula "I am Brahman" is a sorry substitute for intelligent devotion. Hence he emphasised *bhakti* as the only means to salvation.

(5) Though souls and matter are the modes of God, they have enjoyed the kind of individual existence which is theirs from all eternity and cannot be entirely resolved into Brahman. Salvation, which is possible only through *bhakti* and grace, is not the disappearance of the individual soul but its release from the limiting barriers. However high a man may rise, there will always be an Almighty power to reverence, worship and adore. The released soul attains the nature of God, but not identity with him. In the released condition the souls have all the perfections of the Supreme except in two points, namely they are atomic in size while the Supreme is all pervading.

Ramanuja lived for 120 years. During the later sixty years he did not stir out of Srirangam. One day he started praying to Lord Ranganath for permission to leave his body. For some days there was no response. Subsequently, however, permission was received. The saint conveyed to his disciples his decision to leave his body on a certain day. In the meantime, necessary instructions were given to the disciples. On the appointed day in the year 1137 A.D. the saint placed his head on the lap of one disciple and his legs on the lap of another and fixing his gaze on the sandals of his *guru* ended his eventful life on earth and reached the feet of his *ishtam*, Lord Vishnu.

Sree Chaitanya And His Kirtan Song

SAMAR DUTTA

Bountiful nature provided the inhabitants of ancient India with primal necessities of life, and thus gave them ample leisure to carry on their activities in the domain of art, literature, music, dance, drama, painting and things like that. Throughout the centuries gifted composers enriched Indian music with new creations. But Sree Chaitanya Mahaprabhu created a song known as Kirtan and introduced it in the realm of Indian music not solely and wholly for the purpose of enriching that music. This new creation, as a form of love and devotion was the distinctive feature of Sree Chaitanya's cult. The chanting of Lord's name was deemed by him to be as efficacious as any other path for the attainment of the summum bonum of life. Sacrifice and penance were not for Koli Yuga. The paths of Karma and Jnana were difficult to tread. To the sorrow-stricken world, Chaitanaya brought the message of the value of God's name. The door of ecstasy and realisation was made available by the easy method of Kirtan.

A great act of Chaitanya period (1485 1533) was the conversion of the brothers called Jagannath and Madhava, who had made themselves notorious by their wicked and sinful acts. This miracle is frequently referred to in Vaishnava songs, as an act of great compassion, which has a deep significance even in the present age which, in spite of its material prosperity of gigantic type, is defiled by greed, hatred, malice bickering and strife of man against man.

The circumstances under which Chaitanya created Kirtan was that in pre-Chaitanya period the music became the property of the royal court. At that time Indian classical music had been patronised by the said court to such an extent that people in general had lost their link with that music. In those days folk-songs were the favourite ones of the common people. But those songs could not cross the boundaries of a province. Nor could they leave the boundaries of a village within a province. Moreover, due to different types of spoken languages then in vogue in different regions it was rather difficult to understand what the folk-songs meant and as such people failed to enjoy those songs. Therefore, the area of folk-songs was limited.

However, the light music which was created by Chaitanya came to be known as Nam Sankirtan. It grew increasingly popular with the passing of time. This is a kind of song which contains softness and sweetness considerably. It brings relief and peace to the neglected and sorrow-stricken people.

After the birth of Indian music attempts had been made to introduce time-element in the composition of songs. Attempts were also made to discover class-system in the sphere of music. The experts (Ustads) in the musical line pointed out invidious distinction between the songs of happiness and those based upon Darbari Kanara and the like. Dispite all these problems Chaitanya realised that music had its inherent quality

which was capable of influencing the mind of one and all under any circumstances what so ever as it was able to transcend the limits of time and all transient emotions. Chaitanya established that his Kirtan was a broad-based one and that it was quite suitable for all those who had the thirst for religion and yearned for God s grace. To the critics who undermined the quality and value of such a song and tried to suppress it he advanced sound arguments in support of his creation. Nam Sankirtan bound many a person with the tie of love and fellow-ship It had shaken people out of stupor and at the same time it enlivened them with the dynamic life-current emerging from the creative contribution of the apostle of Gauriya Vaishnavism

Chand Kazi (Moulana Serajuddin) of Nabadwip was annoyed with Chaitanya for his Kirtan song. He issued an order which forbade holding of Sankirtan with effect from a certain date. Chaitanya at the out set obeyed that order into. None in any house at Nabadwip sang Kirtan that day. Yet that was the day on which Chaitanya led a massive procession to the house of Chand Kazi who, being infuriated, came out to punish Chaitanya severely. But to his utmost astonishment he found the processionists perfectly calm and quiet. Not a single word of protest came out of the lips of any body. But every body sang Kirtan in a low voice along with their preceptor and leader, Sree Chaitanya. The Kazi realised that the collective appeal of people was much more powerful than the order of an individual in spite of his holding an exhalted position In the administration of a country.

The Pundits (men of erudition) who believed in the teachings of the Vedas gave the country the scripture that contained religious codes which appeared extremely difficult to be followed. But Chaitanya gave the country a wonderful melodious song coupled with equally wonderful lyricism. Through that song people felt the rhythm that lay hidden in their breasts And that rhythm was the one that held together all classes of people with the bond of love and joy which, according to this great prophet, is the dedication of the souls to the cosmic forces of life.

Time has come when we should embrace with all sincerety Chaitanya's philosophy of love which gives us delight supernal in the blessed communion with the transcedent. Perhaps the most simple method of embracing the afore-said philosophy is o sing Kirtan as often as possible.

"There is one supreme 'I' in the cosmos. So meditate on Him as the supreme self. But this is not possible always. In our daily life we have to go through hum-drum which upsets the balance. So we should try to find Him in the shifting scenes of the world. In the rushing life, put Him every where. Try to see Him in every atom."

—Sree Sree Thakur Satyananda

Book Review

Blossoms in the Dust – a book of poems in English by *Santosh Kumar Adhikari*. published by Spark Publications, 81, Raja Basanta Roy Road, Calcutta-700029, Pp 36, price Rs. 10 for hardbound edition and Rs. 5 for popular edition.

Shri Santosh Kumar Adhikari who is a well-known name in modern Bengali literature has made varied contributions both in prose and poetry. His contributions in prose comprise both fiction and non-fiction. He writes with ease and elegance both in Bengali and in English. Shri Adhikari who began his literary career more than three decades back has to his credit a good number of published books Bengali and English both in prose and poetry.

Yet Shri Adhikari's latest book of poems in English under review is not a specimen of Indo-Anglican writing as it is known to-day. The thirty one poems collected in this volume are not originally written in English. These are English renderings of his original poems in Bengali. Translation, particularly of poetry, from one language into another, is itself a very difficult task. Poetry is the quintessence of human emotion and ideas full of symbols and imagery drawn from the poet's own experience and born out of his contemporary social life and the country to which he belongs, It is not merely the meaning of a poem which charms us. The overall effect of a good poem prevails upon the reader through its diction, rhyme and rhythm as well as through nuances. It is almost impossible to convey these effects of poetry through translation, however competent it may be.

On reading the poems collected in 'Blossoms in the dust' I have no hesitation in saying that the English translations of Shri Adhikari's poems have been made by competent hands who are themselves established in their own field of activity. The value of translation in a multi-lingual country like ours can hardly be denied. It is only through translation from one language into another that we are able to understand the significance of the literary and cultural development of the country as a whole. We find our leaders glibly talking of national and emotional integration. But how can this be achieved except through such cultural understanding at the intellectual level ? Translation helps us to rise above the barriers of language.

However, to come back to the discussion on this book under review I would like to say that Shri Santosh Kumar Adhikhri is a sensitive modern poet with an urbanized outlook though he has a nostalgic love for the days of his childhood innocence. His poetic soul is thus torn asunder and the dreams of his dawn of life 'lie scattered like shells'. That is why he wants to 'move like an alien to distant domain' and his tormented' heart blossoms in the dust'. This theme is repeated in a number of poems. In the poem entitled 'The sea-gull' we find that 'the heart is ever-grovelling in the dust in

darkness dream'. His dream memories are skilfully woven through picturesque images drawn from the bounties of nature in many of the poems which even spin round the poet's urban experiences of later years. This is a fascinating book of Bengali poems aptly translated into English by competent translators. Nanda Lal Basu's famous drawing 'The Cleaner Girl' printed on the cover has not only enhanced the prestige of the book but it has also inspired the poet to write an excellent poem of the same name included in this book. I presume that our non-Bengali friends who love Bengali poetry will find it rewarding to go through this book of poems written by Shri Adhikari.

—Gopal Bhowmik

—:•:—

Spiritual Talks

From Sri R. L. Goel's Diary

27. 3. 65.

It was Saturday. Lord appeared in the Western Verandah at about 9·15 P.M. All the devotees who had been waiting for His Darshans in the Northern Verandah went there and prostrated before Him. Lord blessed them all. He was not looking well as He had been suffering from gastric trouble, for the last over two weeks. Aarati had already commenced. Lord entered the Temple Room. There was an unusual crowd of the devotees, for many of them had just arrived from Suri and Burdwan. Amongst the present were, Sri P. N. Mookherji Satyen Chatterji Anand Babu, Nikhil Sen, Dewan, Homesh, Charandas, Bimalananda, Jetha Moni, Swami Nirvedanandji Potikda, 'R' and many other Sadhus. Nachiketasananda arrived late.

Lord again appeared at about 10 P.M. The devotees prostrated before Him. Sri Nikhil Sen, a Radio Artist, sang about several bhajans composed by Lord. Bimalanand also sang a bhajan from Kali Kirtan. Again Sri Nikhil sang two Hindi Bhajans on the request of a Mother devotee. The Gita was then read (V-25). Literally it means : "They win oneness with Brahman—the Seers whose sins are wiped out, whose doubts are resolved, who have mastered themselves and who are ever engrossed in the welfare of all beings."

Lord while commenting on the above said, "These two Books 'Gita' and 'Kathamrita' contain such eternal truths. Gita was written many thousand years ago. But what was true then, is true even now and will ever remain true even thousands of years after. The words (Sarva Bhuta Hite Rata) well being of all is the kernel truth of Gita.

Swami Nachiketasananda : Thakur, those sitting in the Himalayas, if they pray for the well-being of all, that also should be taken as engrossed in the well being of all.

Lord : When you are in the gross body, you have to serve others or help others in the material way, otherwise suppose if you take every day good food and go on saying

' Sarva Bhute Hite Rata," does it or will it satisfy the hunger of your neighbours ? A miserly man having millions does not part with a penny to others and every time repeats ' Sarva Bhute Hite Rata", will it any way help or serve others ?

Swami Nichiketasananda : But Thakur. after hard Tapas a if the ones sitting in Himalayas realize God and then say or feel for the well being of all then ?

Lord : If any one of them realizes God or attains Brahma then should he not step down and come to planes. If one such man comes to Burra Bazar and the people touch His feet at least the Black-Market will stop. All the greatest Seers and God-men have lived amongst the people and lifted them. Rama. Krishna. Chaitanya Mahaprobhu. Bhagawan Ramkrishna, Christ Budha, have they lived in caves or amongst the people ? Kathia Baba, Ramdas after realization came to Brindaban and lived amongst the people to serve them. Only repeating the words "Sarve Bhute Hite Rata" is meaningless. Do it in whatever manner you can.

It was already past 11 P.M. Lord rose up. All the devotees prostrated before Him and left and Lord entered the Temple Room. Jai Thakur.

—:0:—

Bengal Down The Ages

Prof. Kanaambi Nath Mallik

[*Continued from the previous issue*]

Kesab Chandra Sen (1838-1884)

Kesab Chandra Sen was an important member of the Brahmo Samaj. He came of a famous family and even as a student showed deep interest in social service and religious thought. He joined the Brahmo Samaj in 1856 Within a short time of his joining the Samaj he infused new life into the organisation. He put more emphasis on Christian and Vaishnava teachings. The young Brahmos under his leadership began to propagate the new faith with great vigour. Previously only Jesus Christ was the inspirer, but now Sri Chaitanya became more important inspirer to Kesab Chandra and his followers. This led to the breach in the Brahmo Samaj. Kesab broke away from the original Church and founded—the Brahmo Samaj of India. Thus the two party of the Brahmo Samaj came to be known as *Sadharan Brahmo Samaj* and the *Adi Brahmo Samaj*. Fame of Kesab Chandra as an orator and a devout man spread throughout India He was honoured and acclaimed in England in 1870. Kesab Chandra also organised a new Church known as Navavidhan Samaj in which he was regarded as the prophet Kesab Chandra and his followers fought back the drink habit with success and our society was largely rescued from the legacy of "young Bengal." He played an important part in the passing of the Marraige Act of 1872.

Kesab Chandra was a pioneer in the history of Journalism. He knew that news papers play the role of teachers and create public opinion. One pice daily known as 'Sulav Samachar' came out and Kesab issued stirring calls to his countrymen to give up indolence and assert their rights Under his guidance night Schools for young and adult were run in different parts of the country.

Apart from being religious reformer and preacher of a very high order, Kesab Chandra was also a great writer. author and humanitanian, all in one.

Sri Sri Thakur Ramkrishna Deva

Rammohon Roy. Debendranath Tagore, Rajnarayan Basu and Kesab Chandra Sen were quite at home with western culture and earned the esteem of foreign Scholars. But common people failed to find comfort in the faith they preached. The figure that has most inspired their religious consciousness that rooted his doctrine and practice in the ancient creed of the people, Ramkrishna Deva is an immortal name. The year 1836 is a memorable year in the history of Bengal, nay of India. It was in this year Ramkrishna Deva was born at Kamarpukur in the district of Hughli. He came of a very poor family. Since childhood Ramkrishna had an intense religious feeling and devotion. He received little formal education and when about twenty years of age he was appointed priest at the temple of Goddess Kali at Dakshineswar. Kali, the Divine Mother, became to Ramkrishna his living Mother and the Mother of the Universe. In his words, 'I know only my Mother Divine, and that I am her son."

As Ramkrishna believed in all religious doctrines, he explored Islam Christinity and different forms of Hinduism. Consequently he arrived at an understanding of the highest purpose of all religions. All religions are good, he taught his followers, each is a way to God, or a stage on the way, adopted to the mind and heart of the seeker. To be converted from one religion to another, for Ramkrishna, is foolishness. He believed firmly that practice and continued meditation could only make one eligible for having a clear vision of God in concrete form. He tolerated sympathetically the polytheism of the people, and accepted the monism of the philosophers. In his own living faith god was a spirit incarnated in all men. and the only true worship of God was the sincere service of man kind. Thus with Ramkrishna Deva the age of synthesis in religion begins. He did never claim to have founded any new religion. He preached the old religion of India and at the same time infused new blood into it.

(*To be continued*)

Horizon and the Sea

(Translated into English by Sri Jyotsna Nath Mallik from Sri Archana Puri's Bengali Poem

Do you know when the sea and the horizon talk ?
When we are silent
the horizon giving a drop of swati's water asks.
You bring forth a pearl.
The sea says, you cast your spell on its eyes.
then alone my arduousness will succeed.
The sea-birds silently folding their wings move away.
The algae make way for advent of light.
The horizon in hazy moonlight looks on with more intent eyes.
The sea sets adrift its words on the crest of a million waves.
We sit on the shore,
forget to make toyhouses with sand,
forget to collect sea-shells.
Horizon and the sea come densely closer.
They speak near our ears,
in the heart of hearts the words become distinct.
Those are silently recorded in the valves of oysters.
Those are not however history but poetry.
Eloquence of men in conflicts of events
creates history
and their speechless reticence
attested by a supreme Silence
becomes poetry.
I search for a secret concert clue
between history and poetry.
When I shall get it - who knows ?

—:•:—

Society judges all acts by well known and common standards. moments of supreme freedom we go near our deepest self. If we are spiritually alive, any work, however lowly it may be, may bring forth the serene content in us. Socratic virtue, is knowledge, but this knowledge springs from the deeper levels of life. The deeper a man is rooted in spirit, the deeper is his knowledge. The highest morality is not law but love which is beyond the world of claims and counter claims nor does it check and balances. Such lives of honour like Buddha or Christ which are not merely truthful and austere but beautiful beyond all dream.

(World Ethics, Comp. Works of Sreemat Swami Satyananda Dev. Vol. VI, P. 194-195)

"পেশীর ব্যথাবেদনায় আমাকে চটপট আরাম দেয় ইউথেরিয়া"

—কপিল দেব

"বল কিংবা ব্যাট করবার সময় প্রায়ই আমার পেশীতে টান ধরে। সেই জন্যই হাতের কাছে সব সময় ইউথেরিয়া রাখি। পেশীর ব্যথাবেদনায় আমাকে চটপট আরাম দেয় ইউথেরিয়া। তাছাড়া, মাথাধরা ও সর্দিতেও এটি বেশ ভাল কাজ দেয়। ইউথেরিয়া সত্যিই নির্ভরযোগ্য।"

(কপিল দেব)

সেরা খেলোয়াড়দের পছন্দ ইউথেরিয়া

বেঙ্গল কেমিক্যাল

(ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ)

BEC-0216

With best compliments from :

BHUTORIA ENGINEERING WORKS LTD.

56, NETAJI SUBHAS ROAD,
CALCUTTA-1

Sales Office
8, Lindsay Street
Calcutta-1
Phone : 24-0817
24-0705

Factory
Konnagar
Phone Uttarpara 63-1564

Leading Manufacturers of Ammonia Valves, Diaphragms and other Textile Machineries.

"Truth is one. Know it and realise it."

Swami Abhedananda

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :

Garbeta Ice & Cold Storage

56, Netaji Subhas Road,
Calcutta-1

With Best Compliments Of :

Alliance Mills (Lessees) Private Limited

Head Office 18, N. S. Road, Calcutta-700001

Phone : 22-3401 (5 Lines)

Mills : ALLIANCE JUTE MILLS (South)

JAGATDAL

Phone : Bhatpara 2531, 2532, 2150

Gram : ALJUTLES Telex : EIC CA-7023

Manufacturers and Leading Exporters of :

Quality Hessian Cloth & Bags, Sacking Cloth and Bags, Rove, Yarn & Twine

Attractive Branding and Brightening arrangements.

With Best Compliments of

SAMPAT CERAMICS PVT. LTD.

11, POLLOCK STREET,

CALCUTTA

"Very few understand that the aim of human life is to see God."

—Sree Ramkrishna

Space Donated By :

Phone : 35-3779

SREE MUDRAN

40, Shibnarayan Das Lane,

CALCUTTA-700006

Phone : 57-3129

With Lord's Blessings :

Sheet & Metal Industries

134, JESSORE ROAD

CALCUTTA-28

Manufacturers of :

TEA CHEST FITTINGS, SPRAYERS

AND

TEA GARDEN SUPPLIERS

Works Phone : 65-3293

With best compliments of

Mazumder Engineering Co. (Private) Ltd.

Manufacturers of Heat Resistant, Acid Resistant, Ni-Hard and all types of Graded Iron Castings according to Indian Standard Specification.

Regd. Office :
11, ULTADANGA ROAD
CALCUTTA-4

Works :
6, 'Q' ROAD, MONSATALA
HOWRAH-5

69-2182
69-2221
69-2772

Gram : "DHARUBB" HOWRAH.

With Compliments From :

DHAR RUBBER MANUFACTURING CO.

Howrah-Amta Road
Dassnagar, Howrah

FOR

Automobile & Industrial Rubber Goods

Arise ! Awake ! and stop not till the goal is reached.

— Swami Vivekananda

: 23-4318

With compliments from

Grover Petro-Chem Private Ltd.

6A, 8TH FLOOR, 'COMMERCE HOUSE'

6A, Ganesh Chandra Avenue,

CALCUTTA-700013

For

All kinds of Petroleum Products, Oils, Chemicals.

"To achieve greatness, shelter of a great power has to be taken.
Thus it becomes easy."

— Sree Sree Thakur Satyananda

With compliments of

MEHRA COAL COMPANY

5 & 6, Fancy Lane, Calcutta-1

"Life is a spark of God"

– Sree Sree Thakur Satyananda

With Compliments from

DHIRAJ CHANDRA SARKAR

Builder and Contractor

2/1A, DINANATH MITRA LANE

CALCUTTA-6

Phone : 55-4556

Remember

Kamala Cycle Mart

for

Cycle, Cycle Rickshaws, Delivery Van, Invalid Cycle

and

Accessories

2A, Bentink Street,
Calcutta-1
Telephone : 23-7885

With best compliments of :

23-6106
23-3065

Indian Timber Supply Agency
167, MAHARSHI DEBENDRA ROAD.
CALCUTTA-700007

With Best Compliments From :

Jharia-60611
Calcutta – 23-4948
Resi. : 34-4563
31-1012

KEJRIWAL BROTHERS
PRINCEP STREET
CALCUTTA-700072

Coal Merchant and Colliery Agent

"Divinity is the end of all wisdom."

—Swami Abhedananda

With Compliments From :—

Shree Ramakrishna Manufacturing Company

220, Naskarpara Road,
Ghusuri, Howrah.

With the compliments of :

A. E. A. PVT. LTD.

16, Gurusaday Road,
Calcutta-700019
Phone : 44-6161, 43-2317

With the best compliments of :

INDIA TRADING OIL CO.

236, Lower Circular Road
CALCUTTA-700020

Phone : 44-1741

With Best Compliments From

Momo Enterprises

Painters & Interior Decorators.

58/1A, TOLLYGUNGE ROAD,
CALCUTTA-700033

TEL : 46-6359, 42-3402

"The more we increase the value and extent
of our ego the less becomes the value and extent
of the grace of Thakur."

—Sree Thakur Satyananda

A WELL WISHER

"The religion of religions is our knowledge and realisation and love."

—Swami Abhedananda

With best compliments of :

M/s. Ganeshka Kanoi Tea Co. Pvt. Ltd.

"COMMERCE HOUSE"

No. 2. GANESH CHANDRA AVENUE,

CALCUTTA-700013

"Some diversity has to be created in religious path also if one wants his mind to be constantly engaged in religious subjects. But, that diversity must be with objects divine."

—Sree Archana Ma

FOR

TEA

WARE-HOUSING

23-2.04

23-2505

Remember :

M/s. KANOI TEA PRIVATE LTD.

24, R. N, MUKHERJEE ROAD

CALCUTTA-700001

With the best compliments of

Bengal Oil Water Transport Co.

12, N. C. GHOSH ROAD
BUDGE BUDGE
24-Parganas

With Best Compliments From :

45-1579

M A L B O

Exporters & Manufacturers of Plastics Products

Office :
4A, JAINUDDIN MISTRY LANE,
CALCUTTA-700027

With best compliments of

HIMALAYA AGENCY

DEALERS & COMMISSION DEPOT OPERATORS
BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD.

9, EZRA STREET
Calcutta-700001

Phone 26-9282

With Best Compliments of

ASIATIC PLASTIQUES

Manufacturer of Industrial and Consumer Blow Injection Moulding Plastic Articles.

Factory :
SETH SOORAJMULL JALAN TRUST COMPOUND
220, Naskarpare Road,
GHUSURY, HOWRAH-711007

City Office :
32, EZRA STREET,
3rd Floor, Room No. 351
CALCUTTA-700001
Phone : Office : 26-1903
GRAM : "PROCESSORS"

মেসার্স শ্রীমা শ' মিল

রাধাকিশোর দত্ত এণ্ড ব্রাদার্স

বাঁকুড়া-বর্ধমান রোড,

পো : সোনামুখী, জেলা : বাঁকুড়া

- আমাদের এখানে শিলিগুড়ি সাল, সেগুন মুরগা, শিশু ও গামার ইত্যাদি যাবতীয় হার্ডউড্ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।
- যত্নসহকারে মেশিনে চেরাই করারও ব্যবস্থা আছে।
- ক্রেতার সন্তোষ ও পরিতৃপ্তির প্রতি লক্ষ্য রাখাই আমাদের বৈশিষ্ট্য।

"Be like a flower"

– Sree Sree Thakur Satyananda

M/s. ASH PHARMACY

P. O. DUBRAJPUR, DIST. BIRBHUM

"জগদ্ধাত্রী, যিনি জগৎকে ধরে আছেন, তিনি না ধরলে জগৎ পড়ে যায়।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

রামকৃষ্ণ ষ্টোর্স

পোঃ দুবরাজপুর, জেলা ঃ বীরভূম

যাবতীয় ষ্টেশনারী দ্রব্য সুলভে পাওয়া যায়।

With best compliments from

M|s. Chhedilal Sreenarayan

&

M|s. Lachhmi Narayan Dal & Flour Mills

Manufacturers of :

All Kinds of Pulses

P. O. Dubrajpur, Dt. Birbhum

Gram : "NARAYANCO"　　Phone : Dubrajpur-2

"Ours is to work. The results will take care of themselves."

—Swami Vivekananda

With compliments from :

BINAPANI CINEMA

P. O. DUBRAJPUR

Dist. BIRBHUM

With best compliments from

"The Complete Garden Shop"

Sutton & Sons (India) Pvt. Ltd.

13-D, RUSSELL STREET

CALCUTTA-700071.

Seeds • Plants • Fertilisers • Pesticides • Garden Tools

• Books • Garden Advisory Service

24-0422

24-0525

24-4030

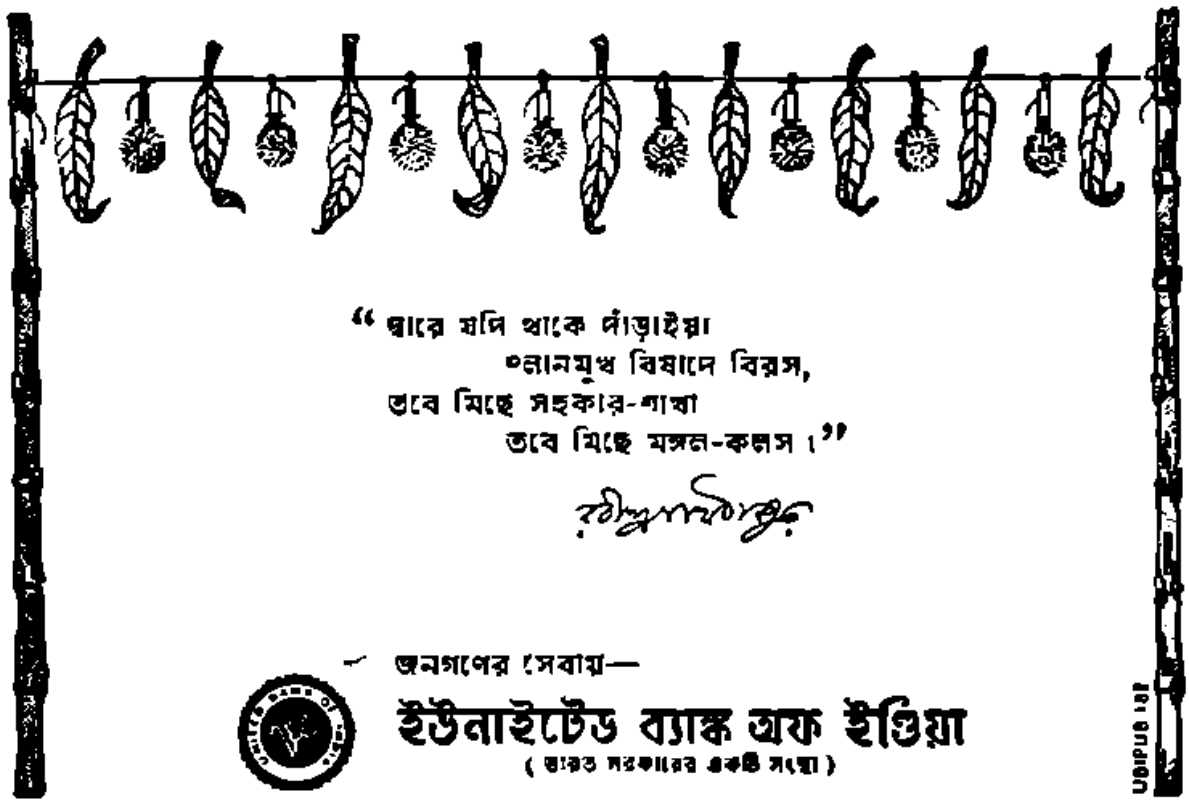

"দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লানমুখ বিষাদে বিরস,
তবে মিছে সহকার-শাখা
তবে মিছে মঙ্গল-কলস।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জনগণের সেবায়—

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

M/s. KISHORI TEXTILES

(মেসার্স কিশোরী টেকস্‌টাইলস্)

বেডশীট, বেডকভার, প্যাণ্টের কাপড়, জানলার
পরদা, ইত্যাদি প্রস্তুতকারক
এবং
পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা।

Office
6, Nitya Gopal Chatterjee Lane,
Calcutta-700002
Phone 55-7611

Works :
5, Lock Gate Road,
Calcutta-700002

"পূজা করতে হয়, সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবৎ প্রতিষ্ঠা।"

—শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দ

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা অয়েল মিল

৭৭-সি, রাজা রামমোহন সরণী, কলিকাতা-৯

ফোন নং ৩৫-৯৬৭৭

শতাব্দীর ওপর পরিচিত জাতীয় সেবায় নিয়োজিত

খাঁটি সরিষার তৈলের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

"এ যুগের ঠাকুর বড় বেশী কৃপাময়। একটু করলেই ঠাকুর কৃপা করবেন।
এ যুগ কৃপার যুগ।"

—শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দ

আপনি কি দাঁতের জন্য কষ্ট পাচ্ছেন,

নীহারিকা

দাঁতের মাজন ব্যবহার করুন। নীহারিকা মন্ত্রের মত কাজ করে।
সুগন্ধ নিঃশ্বাস ঝক্‌ঝকে দাঁত নীহারিকা-এর গুণে আজ চারিদিক মাত।

নীহারিকা প্রডাক্টস (ইণ্ডিয়া)

১০/১/১বি, গোপাল বোস লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯
ফোন : ৩৫-৫৮২১

পরিবার কল্যাণ কর্ম্মসূচীতে সরকারী অনুদান

- যাঁরা ভেসেকটমি করিয়ে নেবেন তাঁদের প্রত্যেককে নগদ ১১৫ টাকা।
- টিউবেকটমির ক্ষেত্রে মায়েদের প্রত্যেককে নগদ ১০৫ টাকা (বিনা খরচে অপারেশন, পথ্য ও ঔষধাদি সহ)
- লুপ গ্রহণের জন্য মায়েদের প্রত্যেককে নগদ ৫ টাকা। উদ্যোক্তা বা PROMOTER-দের জন্য :—

  ক) প্রতি ভেসেকটমি কেসে—নগদ ১০ টাকা।

  খ) প্রতি টিউবেকটমি কেসে—নগদ ৬ টাকা।

  গ) প্রতি লুপ কেসে—নগদ ২ টাকা।

বিজ্ঞাপন সংখ্যা :—২০৮ / ৮২-৮৩

রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের মাস মিডিয়া ডিভিশন কর্তৃক প্রচারিত।

With Best Compliments From :

SINHA & CO.

60, Sitaram Ghosh Street,
Calcutta-700009

For Two-Year Degree Course
Prof. K. G. Mazumder

- A Text Book of General Physics –
- A Text Book of Heat –
- A Text Book of Optics
- A Text Book of Sound –
- A Text Book of Magnetism and Electrostatics –
- A Text Book of Current Electricity & Modern Physics
- Practical Physics –

উচ্চ-মাধ্যমিক [একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী]

অধ্যাপক কে. জি. মজুমদার

উচ্চ-মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান (১ম, ২য়)
উচ্চ-মাধ্যমিক ব্যবহারিক পদার্থবিজ্ঞান – ঐ
উচ্চ-মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান সহায়িকা – ঐ
Higher Secondary Practical Physics – Prof. K. G. Mazumdar

IDEAL PUBLISHERS
14, Ramanath Mazumdar Street
Calcutta-700009

For Two-Year Degree Course

- Higher Algebra (C.U.) – Basu, Chatterjee
- Higher Algebra (B.U. & N.B.U.) – Do
- A Text Book of Analytic Geometry – M. C. Chaki
- Dynamics of a Particle Prof. S. R. Maiti & Prof. A. Maiti

উচ্চ মাধ্যমিক [একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী]

- H. S. English Companion – Prof. M. Chakraborty
- উচ্চ-মাধ্যমিক প্রবন্ধ বিচিন্তা – অধ্যাপক পি. আচার্য্য
- উচ্চ-মাধ্যমিক গণিত (১ম, ২য়) – অধ্যাপক মাইতি ও ভট্টাচার্য্য
- উচ্চ-মাধ্যমিক ত্রিকোণমিতি সহায়িকা – অধ্যাপক চক্রবর্তী ও সরকার
- উচ্চ-মাধ্যমিক রসায়ন (১ম, ২য়) – প্রিয়নাথ কুণ্ডু
- উচ্চ-মাধ্যমিক ব্যবহারিক রসায়ন – ঐ
- উচ্চতর মাধ্যমিক রসায়ন (ঐচ্ছিক) – ঐ
- উচ্চ-মাধ্যমিক জীব-বিজ্ঞান – গাঙ্গুলী, গুপ্ত ও সাহু
- উচ্চ-মাধ্যমিক জীব-বিজ্ঞান সহায়িকা – অধ্যাপক রবীন্দ্রনারায়ন পাল
- উচ্চ মাধ্যমিক শরীর শিক্ষা – ডাঃ অচিন্ত্য-কুমার মুখোপাধ্যায়

Calcutta Publishers
14, Ramanath Mazumdar Street
Calcutta-700009
Phone : 34-8644

"ঠাকুরের কাজ যা করছ উত্তম তপস্যা। ঠাকুরের মনে যদি একবার হয় যে, ছেলেটা আমার জন্য খেটে খেটে গেল তাহলে তোমার চৌদ্দ জনম বন্ধ হবে।"

—শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দ

With Best Compliments From

Hooghly Binding Works

76/A. Acharya Prafulla Chandra Road,

Calcutta 700009

With Best Compliments Of :

রামকৃষ্ণ প্রণাম

শ্রীরামকৃষ্ণ অনুরাগীদের নিকট মেনোলা রেকর্ডে ভক্তিরসাত্মক গান

যা, সমস্ত ভক্তবৃন্দের কাছে অমূল্য পাথেয় হয়ে থাকবে।

একটি 45 R.P.M. Standard Play রেকর্ডে প্রকাশিত

Side 1 রেকর্ড নং—AQS 104 (STEREO)

জয় রামকৃষ্ণ পরমহংস কথা : মৃন্ময় চক্রবর্তী, সুর ও শিল্পী : শম্ভু মুখোপাধ্যায়

Side—2

তুমি ব্রহ্ম রামকৃষ্ণ কথা : শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী, সুর ও শিল্পী : শম্ভু মুখোপাধ্যায়

এছাড়া—33 1/3 R.P.M. রেকর্ডে গুরুদাস ও মলিনা দেবী অভিনীত বাংলা নাটক

রাণী রাসমণি

সরাসরি যোগাযোগ করুন :—

N. B. SEN & BROTHERS

11, Esplanade East, Calcutta-700069, Ph. : 23-5978/6548

With Best Compliments Of :

Fermentation Industries (Private) Ltd.

KALYANI CHANDMARIR MORE

P.O.—GAYESHPUR

Dist.—NADIA.

চার দশক আগেও ছোট্ট অর্জুনের
স্বাস্থ্যকে বলা যেত নিছক
ভাগ্যের হাতে ভিক্ষা

আজ হাজার হাজার মানুষের হাতের নাগালে
ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যালস্-এর তৈরি উন্নতমানের ওষুধ

১৯৩৬ সালে জনকয়েক ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক, রসায়নবিদ্ ও ফার্মাসিস্ট বন্ধু উপলব্ধি করেছিলেন সাধারণ দেশবাসীর সামর্থ্যের মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত ওষুধ পত্রের শোচনীয় অভাবের ভয়াবহতা।

তাঁদের সেদিনের প্রতিকারের প্রয়াস পরিণতি পেয়েছে ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যালস্-এর বিভিন্ন ধরনের উন্নতমানের প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র। ফলে লক্ষ লক্ষ দেশবাসী অব্যাহতি পেয়েছেন ওষুধের অভাব থেকে, ছোট্ট অর্জুনের মতোই।

ডাক্তারদের কাছে ইস্ট ইণ্ডিয়া,
একটি বিশ্বস্ত নাম

ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কস লিমিটেড
৩ সিনাগগ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০১৬

With Best Compliments From

Phone : 77-6274

M/s. Friends Enterprise

43, Bose Para Road,
Calcutta-700008

With Best Compliments From :

M/s. National Tobbaco Co.

A Division of Dancans Agro-Industries Ltd.

1 & 2, Old Court House Corner,
Calcutta-1

WITH BEST COMPLIMENTS OF :

ESTD. 1919

Hukumchand Jute Mills Limited

Registered Office :
15, INDIA EXCHANGE PLACE,
CALCUTTA-700001

Telegram : "HUKUMILLS" Calcutta
Telex : "HUKUM" CA-021-2771
22-3411 (6 lines)

JUTE MILLS DIVISION

Manufacturers & Exporters of :

QUALITY HESSIAN, SACKING, CARPET BACKING CLOTH, TWINE, COTTON BAGGING, JUTE YARN, JUTE FELT ETC.

CHEMICALS DIVISION

Manufacturers of :

CAUSTIC SODA LYE (RAYON GRADE) LIQUID CHLORINE, HYDROCHLORIC ACID AND HYPOCHLORITE.

Mills at
NAIHATI, P. O. HAZINAGAR-743135
DIST. 24 PARGANAS WEST BENGAL)

Plant at
AMLAI, P. O. AMLAI PAPER MILLS
DIST. SHAHDOL (MADHYA PRADESH)

With The Best Compliments Of :

Gram : "KAMALAPIPE" Phone : 35-4434

PLEASE CONTACT

Kamala Sheet Metal Industries Private Limited

98 & 99, BELIAGHATA MAIN ROAD,
CALCUTTA-700010

(Members To Indian Standard Institution)

"দেহের শুদ্ধির দরকার মনের শুদ্ধির দরকার।"
—শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দ

With best compliments of :

Hindustan Oil Storage & Distribution Company

23, A. M. Ghosh Road, Budge Budge
Phones : 611 226 & 611 507

A Leading Storage Enterprise In Eastern India For Liquid & Dry Cargo.

Calcutta Offices : 53, Chowringhee Road,
Calcutta-700071

Phones : 44-0915, 43-1587
Telex : 021-3101 Musk In
Telegram : "TEADURG", Calcutta

With Best Compliments of

HASIMARA INDUSTRIES LTD.

5 & 7 NETAJI SUBHAS ROAD
CALCUTTA-1

DIVISION :

Beech Tea Garden	Doors
Bhornobari Tea Garden	Doors
Satali Tea Garden	Doors
Tumsong Tea Garden	Darjeeling

Producers in India's Finest Tea & Largest Tea Producers Areas in India

Gram "DEVENPORT" Phone 23-7383 (5 Lines)

With Best Compliments of

Shree Carrying Corporation

7, TARACHAND DUTTA STREET,
CALCUTTA-700073

Gram BANKEYSON

34-6214
24-9627

With Best Compliments of

M/s. Diamond Investment & Properties Co. Ltd.

3, SYNAGOGUE STREET,
CALCUTTA-700001

With Best Compliments of

WOODCHEM INDUSTRIES

Brooke Bond
TAJ MAHAL TEA
Blended just the way
you'll love it

TASTE PLUS
STRENGTH

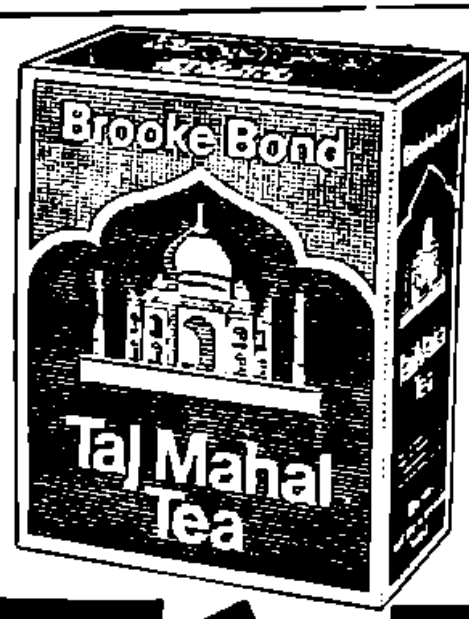

Ah! TAJ

"বিশ্বাস কি সোজা কথা, বাবা? বিশ্বাস শেষের কথা। বিশ্বাস হলেই তো হয়ে গেল।"

—শ্রীশ্রীসারদা মা

With Best Compliments of

Medical And Surgical Corner
66, R. B. Ghose Road,
Burdwan.

Whole Sale Distributor's of Surgical Goods,
Medicine And Cosmetic Goods etc.

ফুল সুন্দর হও

—শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দ

With Best Wisher :

Dr. A. K. PAL
Shyam View Nursing Home,
Burdwan.

With best compliments from

Gram : JATIASWAN
CALCUTTA

Telex :
7422

Phone : 22-4644/9
(6 Lines)

Castend Paper Industries Limited

18, Netaji Subhas Road,
Calcutta-700001

Manufacturers of Quality Paper

Factory :
BANSBERIA, DIST : HOOGHLY
(Phone : TBN, 365 & 425)

With Best Compliments Of

SADHURAM AGARWAL

Carrying Agent : ASSAM BENGAL CEREALS LTD.
Dooars Branch India Tea Association

MAHANANDA PARA
BURDWAN ROAD
SILIGURI-734401
PHONE-21928

H. O.
TELIPARA AIRFIELD
P.O. BINNAGURI
DT. JALPAIGURI
PHONE : 3-BNT.

PAPER CRISIS AHEAD :
MORE MACHINES MUST MOVE

And we make machines. Many more such machines must move and move fast to avert an acute scarcity of Paper. Paper is indispensable. Scarcity of this vital material will place the country's economic and intellectual advancement in jeopardy.

Backed by over 30 years' experience, we have developed facilities and expertise to manufacture and install the full range of paper and pulp machinery. Capacity ranging from 2 tonnes to 250 tonnes per day. Our association with almost all the leading paper mills bear eloquent testimony to the superior performance of our pulp and paper mills machines.

PAPER SPELLS PROGRESS—AND THOSE WHO MAKE IT – RELY ON US

ENGINEERING DIVISION

Eastern Paper Mills Limited

India's Leading Manufacturers of Pulp, Paper and Board Mill Machines.

WORKS AND ADMINISTRATION OFFICE
2, DAKSHINDARI ROAD
CALCUTTA-700048

Cable : EASTRNPAPER
Telex : 021 2460 EPM IN

572736
572737
572439

With Best Compliments of :—

MITRA CONSTRUCTION

CIVIL MECHANICAL TRANSPORTING GENERAL ORDER SUPPLIERS

(Alloy Steels Plant)

Head Office : ARJUNPUR
DURGAPUR-713215

Site Office : A. S. P.
DURGAPUR-713208

শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের পুস্তকাবলীর কয়েকটী

যুগে যুগে যার আসা— (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবজীবনের ও সাধনমার্গের এক অপূর্ব জীবনালেখ্য) টা ৭·০০

যুগাচার্য (শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দের জীবনবেদ অবলম্বনে জীবনী গ্রন্থ) টা ৬·০০

বেদছন্দা— (শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের অমৃতবাণী সঙ্কলন—৫ খণ্ড একত্রে) টা ৬·০০

কথামৃত-কথা (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের কিছু বাণীর আধুনিকযুগসম্মত ব্যাখ্যা) টা ৮·০০

জপ-ধ্যান— (জপ ও ধ্যানমার্গে অধ্যাত্মসাধনার সহজ নির্দ্দেশ) টা ৬·০০

Complete Works— (In Eigth Volumes) Rs. 120·00

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন, ২, পি. কে. সাহা লেন,
কলিকাতা-৭০০০৩৬ : ফোন ৫২-৭১৩৩

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন, ২নং প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, কলিকাতা-৩৬ হইতে প্রকাশিত ও শান্তিধাম প্রেস মহামিলন মঠ, কলিকাতা-৩৩ হইতে মুদ্রিত (ফোন : ৫২-৩১৭১)। মুদ্রাকর ও প্রকাশক—স্বামী পরমানন্দ।

With the best compliments from :

KUMARDHUBI FIRECLAY & SILICA WORKS LIMITED

PIONEERS IN REFRACTORIES FOR

Iron & Steel Industries :

Specialist In High Alumina Checkers for Stoves, Blast Furnace Bottom Blacks, Bloating Nozzles, Zircon Nozzles, High Grog/High Alumina Ladles, Coke Oven Bricks, Roof Bricks for Electric Arc Furnace, Monolithics for Maintenance.

Cement Industries :

Reknowned for 70 Per Cent and above Alumina Bricks of Kiln Lining.

Glass Industries :

Most Exprienced in Sillimanite Bricks and Blocks, Zircon, Mullite and Zircon-Mullite Bricks.

Petro Chemicals & Fertilizers :

Super High Alumina-Bricks and Monolithics Meeting Their Most Stringent Requirement

We are The Licencee of Two NRDC Processes

(i) Casting Pit Refractories of Bloating type

(ii) Synthetic Mullite Corundum.

Registered Office :

CHARTERED BANK BUILDING

CALCUTTA-1

Telephone 22-2351 (18 Lines)

Telegram : FLAMEBIRD

Telex Ca-7222

With Best Compliments Of

19 NOV 1982

Derby Industrial Projects (Pvt.) Ltd.

16, HARE STREET, CALCUTTA-1

Manufacturers Of Highest Grade Indutrial Explosives.

Factory
Matkambeda,
Dist. Keonjhar,
Orissa.

... পত্রিকা সমিতি ; বার' অবতরণ। পত্রিকা সমিতি—স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী অক্ষয়ানন্দ। সম্পাদক—... সহ-সম্পাদক—স্বামী ধীরানন্দ ও স্বামী ধ্যানানন্দ। নিবেদী—... স্বামী ...